বাংলাপিডিএফ

৬৭-৬৮ দুই খণ্ড একত্রে

চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে

রোমেনা আফাজ

সাইক্লোনের কবলে দস্যু বনহুর

রুনি

দস্যু বনহুর সিরিজ

দুই খণ্ড একত্রে

চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে-৬৭
সাইক্লোনের কবলে দস্যু বনহুর-৬৮

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে।

নগ্ন নারী মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। দীর্ঘ এলো চুল, অর্দ্ধেক ছড়িয়ে আছে পিঠে অর্দ্ধেক কাঁধের উপর দিয়ে নেমে এসেছে বুকের উপর—আরও নিচে উরু পর্যন্ত। যাদুকক্ষের লালচে আলোতে অদ্ভুত লাগছে মেয়েটাকে। রক্তাক্ত দেহ, তীক্ষ্ণ দুটি চোখ, টানা দুটি ভ্রু। সুন্দর সুঠাম যৌবনে উগ্রতায় ভরপুর যেন।

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

মাদাম চীং এসে দাঁড়ালো তার পিছনে!

বনহুর ওর নিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কেমন যেন শির শির করছে বনহুরে দেহটা, এই বুঝি মাদাম চীং তার দেহ স্পর্শ করবে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড কেটে গেলো মাদাম তার দেহ স্পর্শ করলোনা।

বনহুর ফিরে তাকাবে কিনা ভাবছে ঠিক ঐ মুহূর্তে মাদাম চীং একটা শব্দ করলো।

বনহুর চমকে ফিরে তাকাতেই অবাক হলো মাদাম চীং হাতে একটি পানি পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পূর্বে সে দেখেছে ওর হাত শূন্য, পানি সে পেলো কোথায়?

বনহুরের দৃষ্টি আবার এসে পড়লো মাদাম চীং এর নগ্ন দেহে।

মাদাম চীং পানি পাত্রটা এগিয়ে ধরলো বনহুরের দিকে।

বনহুর পিপাসায় কাতর, হাত বাড়ালো সে মাদাম চীং এর হাতের পানির পাত্রটার দিকে।

মাদাম চীং পানি পাত্রটা বনহুরের হাতে না দিয়ে ওর মুখের কাছে তুলে ধরে।

বনহুর তখন এতো বেশি পিপাসার্ত যার জন্য সে কিছু ভাবতে পারেনা, পান করে সে ঐ তরল পদার্থ। কিন্তু একি তার সমস্ত শরীর কেমন যেন তোলপাড় করছে। চোখ দুটো আপনা আপনি মুদে আসছে।

বনহুর টলতে লাগলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আর একটু তাহলেই সে পড়ে যাবে। এমন সময় একটি কঠিন আওয়াজ তার কানে এলো। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুর সম্মুখে—দেখলো অদ্ভুত চেহারার একটি লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করেছে।

এরপর আর কিছু মনে নেই বনহুরের। সংজ্ঞাহীন দেহটা ওর ঢলে পড়ে মেঝেতে নগ্ন নারী মূর্তির পায়ের কাছে।

যখন জ্ঞান হলো, চোখ মেলতেই দেখলো সে এক সুন্দর বিছানায় শায়িত আছে। যে কক্ষে শায়িত সে কক্ষটা সুসজ্জিত না হলেও সুন্দর তাতে কোন ভুল নেই।

বিছানায় উঠে বসতেই কানে এলো চীনা ভাষায় একটি শব্দ বৎস আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো।

বনহুর কক্ষের চারিদিকে তাকালো কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলোনা সে। বনহুর আবার ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলো। স্মরণ করতে চেষ্টা করলো সে এখন কোথায়। শরীরটা এখন বেশ ভাল লাগছে মাথাটাও তেমন ঝিম ঝিম করছে না। বনহুর আবার চোখ মেললো, মনে পড়লো সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশের কথা। সেই বিরাট গুহা বা ছাতের অন্ধকারে দোল খাচ্ছে কতকগুলো মৃত দেহ। দেয়ালের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তাভ লালচে আলোর রশ্মি। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর এক একটা মূর্তি যেন জীবন্ত এক একটা রাক্ষস। বিরাট বিরাট সাপের মূর্তি ওদের নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ স্পষ্ট শুনেছে। যে শয্যায় সে অঘোরে ঘুমিয়েছিলো আসলে সেটা শয্যা ছিলোনা, কতকগুলো শব দিয়ে ভেলা তৈরি করে শয্যা বানানো হয়েছিলো। কি বিদঘুটে গন্ধ সেই শবদেহগুলোর। অসহ্য পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ একটা শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলো একটি নগ্ন নারীদেহ। সে চিনতে পেরেছিলো মাদাম চীংকে.....কিন্তু সে তাকে পানি ভ্রমে কি খেতে দিয়েছিলো। এমন কোন জিনিস যা পান করার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিলো তারপর এক শব্দ ফিরে তাকাতেই দেখেছিলো একজন অদ্ভুত চেহারার মানুষ .....তারপর আর

কিছু মনে নেই। এখন সে কোথায়, এতো পূর্বের সে কক্ষ নয় আর কেইবা তাকে এভাবে আরও কিছু সময় শুয়ে থাকার জন্য অনুরোধ করলো.....

একটা হাসির শব্দ হলো, চমকে উঠলো বনহুর ফিরে তাকাতেই আবার কানে এলো সেই কণ্ঠ—বৎস তুমি যা চিন্তা করছিলে সব জানতে পারবে। বুঝেছি এই মুহূর্তে জানতে চাও। বেশ, শোন, আমিই সেই অদ্ভুত মানুষ; আমাকে দেখনি তো কোনদিন, তাই চিনতে পারনি। আমিই চীনের শ্রেষ্ঠ যাদুকর হুয়াংচু।

বনহুর অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় বসে কান পেতে শুনছিলো, দুচোখে তার বিস্ময়, মনে হচ্ছে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কেউ কথাগুলো বলছে কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছেনা। এমন কি তার নিঃশ্বাসের স্পষ্ট শব্দও শুনতে পাচ্ছে বনহুর।

হুয়াংচুর নাম শুনে তড়িৎ গতিতে সোজা হয়ে বসে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে বনহুর—তুমি—তুমিই পৃথিবীর যাদু সম্রাট হুয়াংচু!

হাঁ, লোকে তাই বলে।

কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?

সব সময় আমাকে তুমি দেখতে পাবে না।

দেখতে পাব না?

পাবে কিন্তু বিশেষ কোন মুহূর্তে। যেমন তুমি একবার আমাকে যৎকিঞ্চিত দেখেছো। আমাকে দেখলে তুমি সহ্য করতে পারবে না। যেমন তুমি সবচেয়ে সুন্দর তেমনি আমি সবচেয়ে কুৎসিত। একটা হাসির শব্দ শোনা গেলো।

তারপর আবার সেই কণ্ঠস্বর—আমার কন্যা মাদাম চীং বড় কুমনোবৃত্তি মেয়ে। তার কক্ষে তুমি কঙ্কাল এবং নর-দেহ দেখেছো এগুলি সব তার খেয়ালের শিকার। আমি যদি ঠিক মুহূর্তে গিয়ে হাজির না হতাম তাহলে তোমার অবস্থাও ঐ সব দেহগুলোর মত হতো। দস্যু সম্রাট.....

চমকে উঠলো বনহুর। সে দস্যু, সে কথা হুয়াংচু জানলো কি করে। অবাক বিস্ময়ে তাকালো বনহুর সম্মুখে শূন্যতার দিকে।

কিছু বলবার আগেই পুনরায় শোনা গেলো সেই কণ্ঠস্বর—তুমি কে এ কথা আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যে মুহূর্তে জিহাংহায় পা রেখেছো সেই মুহূর্তে আমি জানতে পেরেছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু আজ চীন রাজ্যে পদার্পণ করলো।

বনহুর অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—হুয়াংচু!

হাঁ—আমি তারপর থেকে তোমার দর্শন আসার প্রতিক্ষা করছিলাম দস্যু বনহুর।

আরও বিস্ময় জাগলো বনহুরের যাদুকর তার নামটাও জানে।

হাঁ তোমার নামও জানি এতে অবাক হবার কিছু নেই।

এবার বনহুর বলে উঠলো—হুয়াংচু তুমি আমার মনের কথা জানতে পারছো কি করে বলো?

বনহুর তুমি যাদু বিশ্বাস করোনা, যদি করতে তবে বুঝতে পারতে পৃথিবীতে এখনও তোমার জানার অনেক বাকি আছে।

বনহুর ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় এক গভীর চিন্তার অতলে। শুনতে পায় সে পদ শব্দ কেউ যেন বেরিয়ে গেলো তার কক্ষ থেকে।

বনহুর ভাবছে সত্যই সে যাদু বিশ্বাস করে না এবং করে না বলেই সে কোনদিন যাদু বিদ্যা নিয়ে চিন্তা করেনি। এই সুদূর জিহাংহায় এসেছে সে শুধু হামবার্ট কে খুঁজে বের করার জন্য, আর তার গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে সব কিছু উদঘাটন করে তাকে নিঃশেষ করাই হলো তার মূল উদ্দেশ্য। হামবার্টকে খুঁজে বের করতে বেশি সময় লাগেনি তার। অপ্রত্যাশিতভাবে হামবার্ট ও তার গোপন ঘাটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঐ শয়তানটাকে বনহুর শুধু হত্যাই করতে চায় না। ওর কুকর্মের মূল শিকড় উপড়ে ফেলতে চায়।

হাঁ পারবে তুমি! আবার সেই কণ্ঠস্বর—পারবে কিন্তু তোমাকে এ জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

সংগ্রাম! বনহুর উচ্চারণ করলো।

হাঁ বৎস সংগ্রাম কারণ ঐ শয়তান শুধু সাংঘাতিক নয় অতি ভয়ঙ্কর। বনহুর আমি তোমার আগমন প্রত্যাশায় ছিলাম। জানি তুমিই পারবে ঐ নর পশুকে শায়েস্তা করতে।

পারবো?

হাঁ পারবে। তুমি পারবে দস্যু বনহুর—তুমিই পারবে।

কিন্তু.....

জানি তুমি ভাবছো ওকে হত্যা করতে তোমার কোন অসুবিধা হবেনা কিন্তু ওর যে গোপন ব্যবসা কেন্দ্রগুলো আছে তা তুমি ধ্বংস করতে পারবে কিনা এ নিয়ে তোমার চিন্তা আছে।

হাঁ আমি ভাবছি সেই কথা। হামবার্টের গোপন ব্যবসা কেন্দ্রগুলো বিনষ্ট করাই আমার মূল উদ্দেশ্য এবং তার সঙ্গে ওকে সায়েস্তা করা।

এবার একটা হাসির শব্দ হলো।

যাদুকরের কণ্ঠ—হাসি থামিয়ে বললো—বৎস আজ পূর্ণ বিশ্রাম করো, আগামীকাল থেকে তোমাকে নিয়ে আমি কাজ শুরু করবো।

পুনরায় পদ শব্দ।

কেউ নে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা এলিয়ে দিলো শয্যায়। সে অনুভব করলো এখন তার মোটেই ক্ষুধা বা পিপাসার ভাব নেই।

মুদে এলো বনহুরের চোখ দু'টো।

যাদুকর হুয়াংচু বনহুরকে অজ্ঞান অবস্থায় একটি ইনজেকশান দিয়েছে যার জন্য ওর ক্ষুধা পিপাসা সমস্ত বিলোপ পেয়েছে।

❑

মাদাম চীং এর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। মেঝেতে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সম্মুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। তার দেহে অদ্ভুত পোশাক, মাথায় অদ্ভুত টুপি। গায়ের আলখেল্লা ধরনের পোশাকটা পা পর্যন্ত। টুপিটা উঁচু হয়ে হাত দুই উঠে গেছে উপরের দিকে।

মাদাম চীং রাগিত কণ্ঠে বললো—নাদাম, বাবা ঐ লোকটাকে নিয়ে কোথায় রেখেছে জানো?

মাদাম চীং, এ কথা আমরা জানবো কি করে। জানবেন আপনি। তবে আমরা সন্ধান নিয়ে আপনাকে জানাতে পারবো।

পারবে?

হাঁ পারবো।

সাবাস, নাদাম যদি ঐ যুবককে এনে দিতে পারো তাহলে আমার গলার এই মুক্তা হার তোমাকে দেবো।

মাদাম চীং।

হাঁ নাদাম পাবে। শুধু তুমি নও যে কোন ব্যক্তি আমার শিকার এনে দিতে পারবে তাকে আমি এ মুক্তা হার দিয়ে পুরস্কৃত করবো।

নাদাম অভিনবভাবে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মাদাম চীং হাত দু'খানা মাজায় রেখে পুনরায় পায়চারী শুরু করলো। কিছুক্ষণ ভাবলো সে পায়চারী করতে করতে তারপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে করতালি দিলো।

অমনি দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে দাঁড়ালো মাদাম চীং এর সম্মুখে।

মাদাম চীং বলে উঠলো কিসাংচু আর লারলিং তোমরা যাও অনুসন্ধান চালিয়ে দেখো কোথায় সেই লোকটি থাকে আমি মিনা বাজার থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।

কিসাংচু বলে উঠলো—মাদাম আমি জানি সে কোথায় আছে।

জানো?

হাঁ জানি।

পারবে তাকে আনতে? যদি পারো তবে এই মুক্তা মালা আমি তোমাকে দেবো।

কিসাংচুর চোখ দুটো জ্বলে উঠে, কারণ ঐ মুক্তার মালা বহু মূল্যবান। চীনের খাটি মুক্তা দিয়ে তৈরি ও মালা এ কথা জিংহাংহায় সবাই জানে। এ মালা ছিলো একদিন চীন সম্রাট কন্যা চিরাচুং এর গলায়। বৎসরে একদিন

চিরাচুং রাজ্য ভ্রমণে বের হতো। হাতির পিঠে হাওদার মধ্যে বসে থাকতো সে, তখন তার গলায় শোভা পেতো ঐ মুক্তা হার। অদ্ভুত এক আলোক রশ্মি বের হতো ঐ মালা থেকে। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়তো চীন সম্রাটের কন্যার গলায়। যাদু সম্রাটের কন্যা মাদাম চীং এর নজরেও পড়লো ঐ মুক্তা হার। যেমন করে হোক ও মালা তার চাই। পিতাকে কথাটা জানালো মাদাম চীং। সম্রাট কন্যার কণ্ঠ হারের লোভ দেখে কন্যাকে সেদিন তিরস্কার করলো যাদুকর। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো সি পিতার তিরস্কারে এবং শপথ করলো যেমন করে হোক ও মুক্তার মালা তার চাই। মাদাম চীং এর অসাধ্য কোন কুকর্ম ছিলোনা, সে এক বৃদ্ধার ছদ্মবেশে চীন সম্রাটের দরবারে গিয়ে হাজির হলো। সমস্ত শরীরে তার চীন তপস্বিনীদের পোশাক, গলায় মালা, হাতে জপ্‌তস্‌বী। মাথার চুল সম্পূর্ণ সাদা ধপ ধপে। মাদাম চীংকে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী ছাড়া কিচ্ছু মনে হচ্ছিল না। চীনি সম্রাট ওকে স্ব সম্মানে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন! কি অভিপ্রায় নিয়ে তার আগমন হয়েছে জানতে চাইলেন তিনি। মাদাম চীং কিছুক্ষণ ধ্যান মগ্ন থেকে চোখ মেলে বললো, সম্রাট বাহাদুর আমি আপনার কন্যা চিরাচুং এর অমঙ্গল বার্তা নিয়ে এসেছি।

মাদাম চীং এর কথা শুনে চীন সম্রাটের মুখ শুকিয়ে গেলো, তার এক মাত্র কন্যা চিরাচুং এর অমঙ্গল বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে এই তপস্বিনী।

চীন সম্রাট যেন আকাশ থেকে পড়লেন তিনি কর জোরে বললেন এ আপনি কি বলছেন তপস্বিনী মা?

হাঁ যা বলছি সত্য। তোমার মেয়ের সম্মুখে বিরাট একটি বিপদ এগিয়ে আসছে।

সে বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় নেই কি?

আছে। আর আছে বলেই আমি এসেছি। তোমার কন্যার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া একান্ত দরকার। আমি তার দেহে মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দেবো তা হলে সে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আমি যখন তার শরীরে হাত বুলিয়ে ফুঁ দেবো তখন সে কক্ষে কারো থাকা চলবে না। কেউ যদি আত্মগোপন করে আড়াল থেকে দেখে তাহলে সম্রাট কন্যা ঐ মুহূর্তে মৃত্যু বরণ করবে কাজেই সাবধান.....

চীন সম্রাট মাদামচীং এর পদধূলি গ্রহণ করে বলে আপনার আদেশ শিরধার্য তপস্বিনী মা। বলুন কোন সময় আপনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান?

চিরাচুং যে মুহূর্তে রাজ্য ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসবে ঐ মুহূর্তে আমি তাকে একটি নির্ভৃত কক্ষে নিয়ে মন্ত্রের দ্বারা তার দেহ শুদ্ধ করবো যেন কোন বিপদ তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে না পারে। কিন্তু যে পোশাকে সে বাহির থেকে ফিরে আসবে ঐ পোশাক না পাল্টাতেই আমি তাকে নির্ভৃত কক্ষে নিতে চাই।

আপনার আদেশ যথার্থ পালিত হবে।

তাহলে আজ চলি।

তপস্বিনী বেশি মাদাম চীং উঠে দাঁড়াল।

সম্রাট ওর পদধূলি গ্রহণ করে।

ঠিক যেদিন চিরাচুং রাজ্য ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলো সে দিন ঐ মুহূর্তেই এসে হাজির হলো মাদাম চীং তপস্বিনীর বেশে।

আশে পাশেই যে কোথাও আত্মগোপন করে ছিলো, সব দেখছিলো মাদাম চীং আড়াল থেকে। সম্রাট কন্যার গলায় ঐ মুক্তা হার আছে কিনা তাও সে লক্ষ্য রেখেছিলো। মুক্তা মালাটা চিরাচুং এর কণ্ঠে জ্বল জ্বল করছে দেখলো মাদাম চীং এবং চীন সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করলো সে মন্থর পদক্ষেপে।

চীন সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো।

পূর্ব হতেই সম্রাট কন্যাকে সব কথা বলে সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন। চিরাচুং হাতির পিঠ থেকে অবতরণ করে সেই নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করলো।

সম্রাট নিজে যাদুকরি মাদাম চীংকে স্ব-সম্মানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

চীন সম্রাটের প্রাসাদ।

সে এক বিস্ময়।

যাদুকরি মাদাম চীং কোনদিন প্রাসাদে প্রবেশে সক্ষম হয়নি আজ সে প্রবেশ করতে পেরে আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলো। এগুলো সে ঠিক তপস্বিনীর গতিতে।

সেই নির্ভৃত কক্ষ।

চীন সম্রাট্ আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কক্ষের প্রবেশ পথ।

মাদাম চীং এর মুখে হাসি।

সে একবার চীন সম্রাটের মুখের দিকে তাকিয়ে পা বাড়ালো দরজার দিকে।

সম্রাট পূর্ব হতেই সে কক্ষটিকে এমনভাবে সবার দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছিলো যে কক্ষের আশেপাশে যাবার কারো সাধ্য ছিলো না।

সম্রাট তপস্বিনীকে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন দরবার কক্ষে।

মাদাম চীং প্রবেশ করলো সেই কক্ষ মধ্যে।

দেখলো একটি আসনে বসে আছে চিরাংচুং। মাদাম চীং এর প্রথম দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সম্রাট কন্যার গলার মুক্তা হারে। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেন তার। মাদাম চীং কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করতেই সম্রাট কন্যা উঠে তাকে অভিবাদন জানালো।

মাদাম চীং অভিনব ভঙ্গিতে তার অভিবাদন গ্রহণ করলো।

সম্রাট কন্যা চিরাংচুং যেখানে দাঁড়িয়েছিলো সেইখানে এসে দাঁড়ালো মাদাম চীং। বললো সে চিরাংচুকে লক্ষ্য করে—বসো।

আসন গ্রহণ করলো চিরাংচুং।

মাদাম চীং বললো—চিরাংচুং আমি যতক্ষণ মন্ত্র পাঠ করবো ততক্ষণ তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে একদৃষ্টিতে। কোন সময় অন্যদিকে তাকাবে না।

চিরাংচুং তাই করলো।

মাদাম চীং বিড়বিড় করে মুখ নাড়তে লাগলো।

চিরাংচুং এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তপস্বিনীর চোখের দিকে।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেলো চিরাংচুর। ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়লো আসনের তলে।

মাদাম চীং মুহূর্ত বিলম্ব না করে ওর গলা থেকে বহুমূল্য মুক্তা হার ছড়া খুলে নিলো।

তারপর আলগোছে বেরিয়ে এলো মাদাম চীং কক্ষের বাইরে।

দরবারে প্রবেশ করে বললো মাদাম চীং চিরাংচুং এর দেহে আমি শান্তি মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দিয়েছি। ও এখন ঘুমিয়ে আছে। যতক্ষণ ওর ঘুম না ভাঙ্গে ততক্ষণ ওর কক্ষ মধ্যে কেউ প্রবেশ করবেন না যেন।

সেদিন মাদাম চীং কৌশলে হস্তগত করেছিলো চীন সম্রাট কন্যা চিরাংচুং এর মালাটা। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই মাদাম চীং তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করেছিলো যেন ওকে কেউ পাকড়াও করতে না পারে বা চিনতে না পারে।

পরে সম্রাট কন্যা চিরাংচুং এর মুক্তা হার চুরি যাওয়া নিয়ে চীনরাজ্যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। চীনা পুলিশ মহলে এ নিয়ে চলেছিলো তোলপাড় কিন্তু সেই তপস্বিনীর সন্ধান আর পাওয়া যায়নি।

সেই মহামূল্য মুক্তা হারের কথা শুনে কিসাংচু আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বললো—আমি জানি সেই যুবক কোথায় আছে।

কিসাংচুর কথা শুনে মাদাম চীং এর মুখখানা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো, বললো সে—জানো? জানো তুমি?

হাঁ জানি।

বাবা তাকে কোথায় রেখেছে জানো?

গুরুজী তাকে তার হীমাগারে রেখেছে।

হীমাগারে! দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে মাদাম চীং এর। বলে আবার সে—হীমাগারে প্রবেশে কারো সাধ্য নেই কিসাংচু।

জানি মাদাম।

তবে বলে কি হলো?

আপনি জানতে চাইলেন তাই বললাম।

মাদাম চীং ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো—জানতে চাইনি চেয়েছি তাকে এনে দিতে পারবে কিনা। কিসাংচু আমার সব কিছুর বিনিময়ে আমি ওকে পেতে চাই।

কিসাংচুর মুখখানা যেমন খুশিতে উজ্বল হয়ে উঠেছিলো তেমনি মুহূর্তে নিস্প্রভ হয়ে গেলো। মাথা নিচু করে রইলো সে।

মাদাম চীৎ পুনরায় পায়চারী করে বললো। কয়েক মিনিট পায়চারী করার পর থেমে পড়ে বলে—কিসাংচু জানি হীমাগার থেকে তাকে বের করে আনা কত কঠিন তবু তাকে আনতে হবে।

কিসাংচু মাথা তোলে।

মাদাম চীং বলে—এক কাজ করতে হবে কিসাংচু, পারবে?

পারবো যদি সম্ভব হয়।

সম্ভব না হলেও পারতে হবে।

বলুন মাদাম? কিসাংচু তাকালো আগ্রহ ভরে মাদাম চীৎ এর মুখের দিকে।

মাদাম চীং বললো—আমার যাদু গুহা মধ্য হতে একটি সুড়ংগ পথ খনন করে হীমাগারে নিয়ে যেতে হবে।

কিসাংচুর বিস্ময় আরও চরমে উঠলো, সে ঢোক গিলে বললো—আপনার যাদু গুহা থেকে সুড়ংগ খনন করে নিতে হবে হীমাগার পর্যন্ত!

হাঁ কিসাংচু এ কাজ তোমাকে করতে হবে।

কিন্তু আমি একা, কি করে এ সম্ভব মাদাম?

একা নয় তোমার সঙ্গে আরও লোক থাকবে।

কিসাংচু বলে উঠলো—কিন্তু আপনার বাবা তার পূর্বেই সব জেনে নেবে এ কথা আপনি জানেন মাদাম।

হাঁ জানি তবু আমি এ কাজ করবো এবং প্রয়োজন হলে আমার শিকার হরণ ব্যাপারে তার সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

পিতার সঙ্গে যুদ্ধ।

তা ছাড়া উপায় নাই। যাও তোমরা আমার গুহায় প্রবেশ করে সুড়ঙ্গ খননের আয়োজন করো।

কিন্তু.....

বল কি বলতে চাও?

আপনার শিকার যদি তিনি সরিয়ে ফেলেন?

হীমাগারের বাইরে তাকে যেখানেই নিয়ে যাক্ আমি তাকে হরণ করবোই করবো। কাজেই হীমাগারে তাকে রাখা ছাড়া পিতার কোন উপায় নেই।

এখানে যখন মাদাম তার শিকারকে হরণ করে আনা নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত আছে তখন সেই হীমাগারে বনহুর পায়চারী করে চলছে।

চারিদিকে সুউচ্চ প্রাচীরের আবেষ্টনী।

কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই।

যদিও কোন দরজা জানালা কিছু নজরে পড়ছে না বনহুরের তবু সে দেখতে পাচ্ছে সব কিছু কারণ হীমাগার অন্ধকার নয়। একটা দীপ্ত আলোকরশ্মি হীমাগারকে আলোকিত করে রেখেছে। আলেকরশ্মি কোথা থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না তবে বনহুর বেশ বুঝতে পারছে যে আলোয় কক্ষটা উজ্জ্বল সে আলো প্রাকৃতিক আলো সূর্যের আলো—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বনহুর আজ ক'দিন এই হীমাগারে বন্দী হয়ে আছে। যদিও তার কোন অসুবিধা হয়নি বা হচ্ছেনা তবু একটা ভীষণ অশান্তি প্রতি মুহূর্তে তাকে বিচলিত করে তুলছিল। যে কারণে সে এই সুদূর জিহাংহায় এসেছে সে কাজ তাকে শেষ করতে হবে। নর শয়তান হামবার্ট শুধু মানুষের শত্রুই নয় সে দেশের অভিশাপ। শত শত মানুষের রক্ত আর চক্ষু উপড়ে নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে চলেছে। এতো রক্ত আর চক্ষু সে কোথায় কি করে জানতে চায় বনহুর.....

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে। অকস্মাৎ যেন কেউ তার কক্ষে প্রবেশ করে। ফিরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ে বিরাট দেহী সেই অদ্ভুত মানুষটা।

বনহুরের চিনতে বাকি থাকে না যাদুকর হুয়াংচুকে।

বনহুরকে দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে উঠে হুয়াংচুং—বৎস আমি ক'দিন ধরে তোমাকে পরীক্ষা করে দেখেছি তুমি আমাকে দেখলে ভয় পাবে না বা সংজ্ঞা হারাবে না। আর সেই কারণেই আজ স্বশরীরে এসেছি তোমার সামনে।

বনহুর ভয় না পেলেও কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলো। কারণ হুয়াংচুর দেহটা এমন দেখতে ছিল যা সাধারণ মানুষের মত নয়।

বনহুর বললো—আমি আপনাকে দেখে ভয় পাইনি বা পাবার মত আমার মনের অবস্থাও হয়নি কারণ আপনি দেখতে যত ভয়ঙ্করই হন না কেনো আপনি মানুষ।

আমি জানি বনহুর তুমি অতি দুর্দান্ত। ভয়ঙ্কর জীব জন্তুকেও তুমি কেয়ার করোনা তাও জানি। কিন্তু আমার কন্যা মাদাম চীং এসব ভয়ঙ্কর জীব জন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ বনহুর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো।

হুয়াংচু গম্ভীর হয়ে বললো—মেয়ে ছেলে হলেও সে কাল নাগিনের চেয়েও বিষাক্ত ও সাংঘাতিক।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো বনহুর বিষাক্ত।

হাঁ কারণ সে সূর্যের তপস্যা করে আর করে কাল নাগের।

এবার বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে, বলে সে—আপনার কন্যা সূর্য এবং কাল নাগের তপস্যা করে?

হাঁ শুধু তপস্যা নয় সে সাধনা করে চলেছে।

সে কেমন?

বৎস সে অতি ভয়ঙ্কর। আমি চেয়েছিলাম আমার কন্যাকে আমার যাদু বিদ্যা দ্বারা একটি সত্যিকারের মানুষ হিসাবে তৈরি করতে। যার দ্বারা পৃথিবীর মানুষের উপকার হবে কিন্তু বিপরীত হয়েছে। একটু থামলো হুয়াংচু তারপর বলতে শুরু করলো সে—মাদাম চীং যখন সাত মাসের শিশু তখন থেকে চললো তার উপর আমার সত্যিকারের যাদুবিদ্যা প্রয়োগ। বনহুর

জানি তুমি যাদু বিশ্বাস করোনা, শুধু তুমি নও পৃথিবীর অনেক মানুষ যাদু বিশ্বাস করে না কিন্তু যাদু আছে। যাদুবিদ্যা শুধু ধোকা বাজী নয়, এতে বিরাট একটা শক্তির আকর্ষণ আছে। তবে সব যাদুবিদ্যাই এই শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়না অনেক যাদু আছে যাদুকর মানুষের দৃষ্টি শক্তির উপর ধোকা বাজী লাগিয়ে চালিয়ে যায়। বনহুর তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখো কিন্তু আমার চোখের দিকে নয়।

এতোক্ষণ বনহুর অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যাদুকর হুয়াংচুর কথা শুনছিলো। যদিও সে পূর্বে দৃষ্টি তুলে ধরে হুয়াংচুর মুখ দেখেছে কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্য। এবার বনহুর ভাল করে তাকালো। প্রথম নজরেই দেখলো বনহুর হুয়াংচুর চোখ দুটি মুদিত। ভাবলো তবে কি হুয়াংচু অন্ধ? সমস্ত মুখখানা যেন একটা পোড়া কাঠ। মাথায় এবং ভ্রুতে সামান্য চুল আছে কিনা সন্দেহ। আগুনে পুড়ে গেলে যেমন চুলের গোড়া গুলো কুঁকড়ে থাকে তেমনি একটু দেখাযায় মাত্র কুঁকড়ে আছে। নাকটা পোড়া কয়লার মত শক্ত এবং কালো। গলা থেকে পা পর্যন্ত অদ্ভুত আলখেল্লায় ঢাকা। বনহুর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

হুয়াংচু বললো—তুমি মনে করছো আমি অন্ধ। কিন্তু আমি অন্ধ নই বনহুর। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলেছি কোন সময় আমি তোমার দিকে চোখ মেলে তাকাইনি কারণ আমার দৃষ্টির তাপ তুমি সহ্য করতে পারবে না। সূর্য সাধনায় আজ আমার এ চেহারা।

সূর্য সাধনা।

হাঁ সূর্য সাধনা। সূর্য সাধনায় আমার চেহারা বীভৎস আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন আমি সাত ঘন্টা নির্নিমেষ নয়নে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকি।

সাত ঘন্টা প্রতিদিন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেন আপনি?

হাঁ।

আশ্চর্য।

তার চেয়েও আশ্চর্য আমার মেয়ে মাদাম চীং।

বনহুর তাকিয়ে দেখে হুয়াংচু দু'চোখ বন্ধ করে তার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। এতোদিন হুয়াংচু তার সম্মুখে স্পষ্টভাবে অবতীর্ণ হয়নি। আজ তাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। লোকটা বলে কি সে সূর্যের সাধনা করে এবং সে কারণে তার চেহারা এমন বিকৃত। এর চেয়েও এর কন্যা বেশি আশ্চর্য বলে কি হুয়াংচু.....

হাঁ যা বলছি সত্য বলছি বৎস। কারণ তোমার কাছে আমি কোন কথা গোপন করবো না। তোমার দ্বারা আমি আমার চরম সাধনা সফল করতে চাই। আমি শুধু সূর্য সাধনা করে যা লাভ করেছি তার চেয়ে বেশি করেছে মাদাম চীং। প্রতিদিন তার দেহে একটি করে বিষধর কাল সাপ দংশন করে। সেই বিষকে হজম করে আসছে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে।

বনহুর বলে উঠে বিশ বছর ধরে মাদাম চীং কাল নাগের বিষ হজম করে আসছে।

হাঁ। সূর্যের সাধনা যে করছে সাত মাসের শিশু অবস্থা থেকে। আর সর্প দংশনের বিষ ক্রিয়া হজম করছে সে সাত বছর বয়স থেকে। তার দৃষ্টিতে এখন আগুন ঠিকরে বের হয় তার স্পর্শে মানুষের মৃত্যু ঘটে। আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছে বনহুর কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। আরও কিছু সাধনা আছে যে সাধনা করলে একজন অপরের মনের কথা জানতে পারে। যেমন আমি জানতে পারি তুমি কি ভাবছো, তোমার মনের কথা। জানতে পারি অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা। যাদু অন্য কিছু নয় কতকগুলো উৎকট সাধনার প্রতিফলন হলো যাদু। এ ক'দিন তুমি আমাকে দেখতে পাওনি কেনো এখনও জানো না। মনে করেছো আমি যাদু দ্বারায় অদৃশ্য হয়ে তোমার সম্মুখে হাজির হয়েছি। আসলে আমার অদৃশ্য হবার কোন ক্ষমতাই নেই। যদি অদৃশ্য হতে পারতাম তা হলে আজ তোমার স্মরণাপন্ন হতাম না। তোমার চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে আমি এ কক্ষে প্রবেশ করেছি তাই তুমি আমাকে দেখতে পাওনি। হাঁ, তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে আমি কি করে তোমার চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে ছিলাম। হয়তো তোমার স্মরণ আছে সেদিন আমার প্রবেশের পূর্বে এই কক্ষে একটি অদ্ভুত রশ্মি দেখতে পেয়েছিলে?

বনহুর স্মরণ করে তার পর বলে—হাঁ একটা ঘোলাটে আলোক রশ্মি দেখেছিলাম।

ঐ আলোক রশ্মি দ্বারা তোমার চোখ দুটোতে এমনভাবে ধাঁ ধাঁ লেগে গিয়েছিলো যার জন্য তুমি আমাকে দেখতে পাওনি। আমি কেনো তুমি ঐ মুহূর্তে কাউকেই দেখতে পেতেনা।

বনহুর ধীরে ধীরে তলিয়ে যায় যাদু রহস্যের অতলে। যাদু বিদ্যা শুধু রহস্যের মায়া জাল নয় এখানেও রয়েছে বিজ্ঞানের সংযোজন। সূর্যের তাপের রশ্মিকে হজম করে দৃষ্টি শক্তি তেজদীপ্ত হয়, যে সৃষ্টি দ্বারা অনেক কিছু অসাধ্য সাধন করা চলে। সর্প দংশনে মানুষ সাপের চেয়েও বিষাক্ত হয়ে উঠে যার স্পর্শে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

বনহুরের চিন্তাধারার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, হুয়াংচু বলে উঠে হাঁ তুমি যা ভাবছো তাই, সত্যিকারের যাদু বিদ্যার সৃষ্টি বিজ্ঞান থেকে। কাজেই যাদুকে তুমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারো না। শোন বনহুর মাদাম চীং দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলেছিল এবং সে তোমাকে যে মুহূর্তে স্পর্শ করতো ঐ দন্ডে তোমার মৃত্যু ঘটতো। তোমার হয়তো স্মরণ আছে মাদাম চীং এর যাদু গুহায় বহু নর কঙ্কাল এবং শবদেহ দেখেছো। ঐ সব নর কঙ্কাল ও শবদেহ ওর লালসার শিকার। কন্যা হলেও আমি তাকে ঘৃণা করি।

স্তব্দ হয়ে শুনলো বনহুর হুয়াংচুর কথাগুলো। যাদুকর যা বললো শুধু আশ্চর্যই নয় চরম বিস্ময়কর। সূর্যের সাধনা, নাগ সাপের সাধনা বলে কি লোকটা। সাপ দংশন করেও সে বেঁচে আছে।

বলে উঠে হুয়াংচু—হাঁ সে বেঁচে আছে বেঁচে থাকবে। বনহুর তুমি যদি নিজের চোখে দেখতে চাও তবে এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর বললো—চল হুয়াংচু চল আমি এ বদ্ধ কক্ষে আর থাকতে পারছি না।

কিন্তু না থেকেও তোমার কোন উপায় নাই বনহুর কারণ মাদাম চীং এর কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করতে হলে আমার এই হীমাগার ছাড়া তোমাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। এই হীমাগারেও তোমাকে রেখে স্বস্তি পাচ্ছিনা কারণ হীমাগার থেকে তোমাকে হরণ করার আয়োজন চলছে।

জানি তার অসাধ্য কিছু নেই তবু সে পারবে না তোমাকে হীমাগার থেকে চুরি করতে।

হুয়াংচুর কথায় বনহুর অট্টহাসিতে ভেংগে পড়ে। হাসি থামিয়ে বলে—দস্যু বনহুরকে চুরি করবে.....হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

হুয়াংচু বলে উঠে— তুমি বিশ্বাস করতে পারবেনা জানি কিন্তু না করেও তোমার কোন উপায় নেই। করতালি দিলো হুয়াংচু।

সঙ্গে সঙ্গে এক জন চীনা দূত এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে।

হুয়াংচু বললো—একে নিয়ে যাও অতি সন্তর্পণে মাদাম চীং এর সাধনা গুহার অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখাও কি করে মাদাম চীং তার সাধনা করে চলেছে।

দূত ইংগিৎ করে বনহুরকে তার সঙ্গে আসার জন্য।

বনহুর ওকে অনুসরণ করে।

কেমন করে কোথা দিয়ে বনহুরকে নিয়ে হীমাগার থেকে বেরিয়ে আসে দূত। তারপর এক সময় তারা পৌঁছে যায় একটি পর্বতমালার পাদদেশ।

নির্জন পর্বতমালার পদদেশে একটি সুড়ংগ পথ। দূত ঐ পথে বনহুরকে নিয়ে প্রবেশ করে। বেশ কিছু দূর এগুতেই একটা শব্দ তার কানে আসতে লাগলো। কেমন যেন ফোঁস ফোঁস শব্দ।

আরও কিছুটা এগুতেই দূত তাকে থামতে ইংগিৎ করলো একটা গর্তের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বললো সে।

বনহুর দূতের ইংগিৎ মত সেই ছিদ্র পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চমকে উঠলো শুধু চমকে উঠলো নয় স্তম্ভিত আরষ্ট হয়ে গেলো। দেখলো মাদাম চীং একটা পাথর খন্ডে বসে আছে তার দেহ অর্ধ উলঙ্গ প্রায়। তার চারপাশে অগণিত নাগ সাপ ফোঁস ফোঁস আওয়াজ তুলে বিচরণ করছে। মাদাম চীং ইচ্ছামত এক একটি সাপের সম্মুখে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে নাগ সাপ দংশন করছে তার হাতে। কখনও সে পা এগিয়ে দিচ্ছে বনহুর অবাক হয়ে দেখলো শুভ্র কোমল-দুটি পায়ে উরু অবধি অসংখ্য সর্প দংশনের জমকালো দাগ।

সর্প দংশনে মাদাম চীং এতোটুকু বেদনা কাতর হচ্ছেনা সে নীরবে সর্পবিষ হজম করে চলেছে।

দূত বনহুরকে নিয়ে ফিরে এলো হীমাগারে।

পরদিন পুনরায় দূতটি এসে হাসির হলো।

বনহুরকে সে ইংগিৎ করলো তার সঙ্গে আসতে।

বনহুর ওকে আজও অনুসরণ করলো। আজ যে পথে তাকে নিয়ে দূত অগ্রসর হলো সে পথ গত দিনের পথ নয়। সে এক অজ্ঞাত পথ।

বহুক্ষণ চলার পর এমন একস্থানে এসে দাঁড়ালো তারা যেখান থেকে বহুদূরে নজর পড়ে। বনহুরের হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাকে সম্মুখে তাকিয়ে দেখতে বললো দূতটি।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রাখলো, স্পষ্ট দেখতে পেলো দূরে একটি নারী নিস্তব্ধ পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে আছে তার চোখ দুটো সূর্যের দিকে সীমাবদ্ধ।

প্রচন্ড সূর্যের তাপে মানুষ এক মুহূর্ত যেখানে দাঁড়াতে পারে না সেখানে দু'চোখ সূর্যের দিকে তুলে একভাবে বসে আছে মাদাম চীং এ শুধু বিস্ময় নয় এক অদ্ভুত ব্যাপার।

বনহুর এবং দূত ফিরে এলো হীমাগারে। হুয়াংচু অপেক্ষা করছিলো বনহুরের জন্য বললো—বৎস এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কেনো আমি বলেছি মাদাম চীং সাংঘাতিক শুধু নয় ভয়ঙ্কর। তার নিঃশ্বাসে বিষ ঝরে। তার নঁখের আঁচড়ে মানুষের মৃত্যু ঘটে তার দৃষ্টি শক্তি মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে। বনহুর, মাদাম চীং তোমাকে হরণ করার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে। যদি সে তোমাকে পায় তাহলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য। শুধু মাদাম চীং নয় হামবার্টের প্রধান অনুচর ফাংফাও তোমাকে খুঁজে চলেছে জিহাংহায়। প্রতিটি জায়গায় সে তল্লাশী করে ফিরছে তোমাকে.....

থামলো হুয়াংচু।

বনহুর বললো—কিন্তু আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত নই এ কথা তুমি জানো হুয়াংচু কাজেই তোমার এই হীমাগারে আমি আটক্ থাকতে রাজি নই।

বললো হুয়াংচু—তোমাকে আটক রাখার সাধ্য আমার নেই জানি কিন্তু কিছুদিন তোমাকে আমার হীমাগারে থাকতে হবে।

কেনো?

তোমাকে আমার প্রয়োজন।

হুয়াংচু আমাকে যেমন তোমার প্রয়োজন তেমনি তোমাকে আমার প্রয়োজন।

বলো বনহুর কি করতে হবে?

হামবার্টের সম্মুখে তোমাকে হাজির হতে হবে।

কারণ?

কারণ হামবার্ট তোমাকে চায় এবং তোমার দ্বারা সে দস্যু বনহুরকে সায়েস্তা করতে মনস্থ করেছে।

কিন্তু আমি জানি সে তোমাকে কারো সাহায্যেই কাবু করতে পারবে না বরং তোমার কাছে হবে তার পরাজয়।

হুয়াংচু শুধু তাকে আমি পরাজিত করতে চাই না। আমি চাই তার সমস্ত কু'ব্যবসা কেন্দ্রগুলির সন্ধান নিয়ে ধ্বংস করতে। তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

নিশ্চয়ই তুমি আমার সাহায্য পাবে। বলো বনহুর—আমাকে আদেশ করো।

হুয়াংচু তুমি বলেছিলে আমাকে তোমার প্রয়োজন, কি প্রয়োজন তা আজও বলোনি।

হাঁ বলিনি তবে তোমাকে নিয়ে আমার বিরাট কাজ বাকি। বনহুর তোমার কাজ শেষ হবার পর আমি তোমাকে নিয়ে আমার কাজ শুরু করবো। যদিও আজ থেকেই আমি তোমাকে নিয়ে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলাম। আমি স্থগিত রাখলাম আমার কাজ। বলো তোমার কি কাজ করতে হবে?

হুয়াংচু তুমি জানো হামবার্ট দস্যু বনহুরের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে জিহাংহায়।

জানি এবং সে তোমাকে সায়েস্তা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে আর সে কারণেই আমাকে সে সন্ধান করে ফিরছে।

হুয়াংচু তুমি সব অবগত আছো। এবার শোন হামবার্টের নিকটে তোমাকে যেতে হবে এবং তার সঙ্গে মিলিত হয়ে দস্যু বনহুরকে সায়েস্তা করার অজুহাতে জেনে নিতে হবে তার গোপন ব্যবসা কেন্দ্রগুলির আসল ঠিকানা।

এবার হুয়াংচু বলে উঠলো—বৎস তুমি হামবার্ট-এর গুপ্ত ব্যবসা কেন্দ্রগুলির অনুসন্ধান করছো তুমি জানোনা আরও একজন আছে যে দস্যু হামবার্টের চেয়েও ভয়ঙ্কর এবং সেই হলো রক্ত আর চক্ষু ব্যবসার অধিনায়ক।

বনহুরের চোখ দু'টো বিস্ময়ে গোলাকার হয়ে উঠলো। বললো বনহুর—কে সে হামবার্টের চেয়েও যে ভয়ঙ্কর? কোথায় সে বাস করে বলো—বলো হুয়াংচু?

বনহুর আমি তাকে সায়েস্তা করার জন্যই তোমার প্রয়োজন বোধ করেছি। যাক্ তুমি নিজেই যখন এ ব্যাপারে উৎসাহী তখন এক ঢিলে দুই পাখি মরবে।

আমিও তাই চাই যেন হামবার্টের চিহ্ন পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারি। আর মুছে ফেলতে পারি তার অভিশাপ ভরা সাধনা কেন্দ্রগুলো.....

ঐ মুহূর্তে একটা শব্দ শোনা গেলো।

হুয়াংচু বললো—বনহুর মাদাম চীং এই হীমাগারে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে কিন্তু সে সক্ষম হবে না কারণ হীমাগার শুধু লৌহ আবেষ্টনী দিয়েই তৈরি করা নয় এর দেয়ালে আছে বৈদ্যুতিক কারেন্টের সংযোগ। যে মুহূর্তে এই হীমাগারের দেয়ালে বাইরে থেকে কেউ স্পর্শ করবে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটবে।

বনহুরের দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠে তাকায় সে হুয়াংচুর মুখের দিকে।

হুয়াংচু দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলছিলো কারণ হুয়াংচু আজ তার দৃষ্টির সঙ্গে বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলে বিপদ ঘটতে পারে। বনহুর অবশ্য এতে ভয় পায় না সে জানে এতে তার ক্ষতি হবে না হয়তো সংজ্ঞা হারাবে।

যেমন হারিয়েছিলো প্রথম দিন সে মাদাম চীংএর দৃষ্টি শক্তির তীব্রতায়।

যদিও বনহুরের দৃষ্টি শক্তির তীব্রতাও কম ছিলো না কিন্তু সূর্য সাধনার দৃষ্টি শক্তির কাছে তার দৃষ্টিশক্তি হার মেনে ছিলো।

বললো হুয়াংচু—বনহুর তুমি প্রস্তুত থাকো আজ আমি তোমাকে নিয়ে যাবো নতুন একস্থানে।

শব্দটা তখন আরও স্পষ্ট সোনা যাচ্ছিলো মাদাম চীংএর লোক হয়তো ভূগর্ভ থেকে হীমাগারে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে।

হুয়াংচু বেরিয়ে গেলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবার। অনেকগুলো এলোমেলো চিন্তা ঘুর পাক করছে তার মাথার মধ্যে। পায়চারী করে চললো সে!

শব্দটা সমান ভাবে চলছে।

কেমন যেন এক অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে মেঝের তলায়।

ভাবছে বনহুর একটা নারীর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে। আশ্চর্য যে নারী আর দৃষ্টিতে বিষ যার, নখে বিষ, দাঁতে বিষ এমনি কি তার সমস্ত শরীরে বিষ। সেই নারী তাকে পাবার জন্য উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে.....বনহুর হেসে উঠে হাঃ হাঃ করে। তারপর হাসি থামিয়ে পায়চারী করে চলে সে।

আচমকা শব্দটা নেমে গেলো।

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, সে পায়চারী বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ শব্দটা শুনতে শুনতে কানটা তার এক টানা শব্দে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। শব্দটা থেমে যাওয়ায় একটু আশ্চর্য লাগছে তার। বুঝতে পারে বনহুর হুয়াংচু বলেছিলো তার এই হীমাগারের তলদেশ ইলেকট্রিক কারেন্ট দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে, যে স্পর্শ করবে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হবে। হয়তো বা তাই হয়েছে।

মাদাম চীং তাকে হরণ করতে চেয়েছিলো কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো...তবে কি?

❑

হুয়াংচু অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে চলেছে তার মাথায় অদ্ভুত টুপি পায়ে অদ্ভুত জুতা। গলায় অদ্ভুত ধরণের অনেকগুলো মালা। মালাগুলো ঝিনুক এবং পাথরের তৈরি। হাতের একটা অদ্ভুত ধরণের লাঠি। কাঁধে ঝোলা।

পিছনে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

যে পথে তারা চলেছে সে পথও অদ্ভুত ধরণের। ঘন বন অতিক্রম করে এগুচ্ছে তারা। বন নয় সে এক অভিনব জঙ্গল অদ্ভুত অদ্ভুত গাছপালা আর লতা গুল্ম।

বনহুর আশ্চর্য হয়ে দেখছে বনের গাছপালাগুলো যেন এক একটা বড় বড় জীব জন্তু। কারণ প্রত্যেকটা গাছের গুড়ির আকার জন্তুর মত। এ আবার কেমন ধরণের বন মনে মনে ভাবে বনহুর।

থমকে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে দাঁড়ায় হুয়াংচু। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলে! বলে সে বনহুরকে লক্ষ্য করে এ বন দেখে তুমি অবাক হচ্ছো বনহুর সত্যি বাকা হবারই কথা। কারণ এ বন সম্পূর্ণ অদ্ভুত। মায়া জাল বা যাদু নয় এ বন ছিলো জিহাংহার অতীতের কোন এক রাজ কুমারীর। সে অত্যন্ত ভালবাসতো পৃথিবীর জীব জন্তুকে এটা তারই বাগান ছিলো এক সময়। রাজ কুমারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং মালিদারা তার বাগানের গাছগুলোকে এমনভাবে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলো যার জন্য এ বাগানে প্রত্যেকটা গাছের গুড়িকে এক একটা জীব জন্তু বলে মনে হতো। আজ সে রাজকুমারী নেই, যে রাজপ্রাসাদ আছে শুধু। তার অভিনব সেই বাগান যা আজ বিরাট এক জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। কথাগুলো শেষ করে আবার চলতে লাগলো হুয়াংচু।

বনহুর ঐ মুহূর্তে কোন প্রশ্ন না করে তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে চললো।

এতো বড় বন অতিক্রম করা কম কথা নয়।

বনহুর ছাড়া অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়তো কিন্তু বনহুর বিনা দ্বিধায় হেঁটে চলেছে।

হুয়াংচু বললো—বনহুর জানি তুমি ক্লান্ত না হলেও একটু বিশ্রাম চাও, কারণ অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করে তুমি দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করেছো। আজ বহুপথ তোমাকে পায়ে হেটে চলতে হচ্ছে।

একটু হেসে বললো বনহুর অশ্ব পৃষ্ঠ ছাড়াও পদব্রজে আমার বহুপথ চলার অভ্যাস আছে হুয়াংচু।

তবে চলো বৎস।

আবার চলা শুরু হয়।

চলতে চলতে বলে হুয়াংচু—জানো এখন তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি?

বলে বনহুর—নিশ্চয়ই কোন শুভ কাজে।

ঠিক বলেছো, বনহুর জিহাংহায় তোমাকে বেশি দিন ধরে রাখতে চাইনা কারণ মাদাম তোমার জন্য উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে তার কবল থেকে তোমাকে বেশিদিন সরিয়ে রাখা সম্ভব হবেনা কাজেই আমি চাই তুমি হামবার্ট এবং তার ব্যবসা কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে যাও তোমার দেশে। এই মুহূর্তে আমি যে স্থানে তোমাকে নিয়ে যাবো সে স্থান অতি দুর্গম। জানি তুমি বহু দুর্গম পথ বিনা দ্বিধায় অতিক্রম করেছো এবারও পারবে।

বনহুর নীরবে শুনে যায়।

চলতে থাকে দু'জনা।

অবশ্য পাশাপাশি নয় হুয়াংচু সম্মুখে আর বনহুর পিছনে।

আরও কিছুটা অগ্রসর হবার পর হঠাৎ সম্মুখে একটা বিরাট সিংহ মূর্তি অশ্বথ বৃক্ষ নজরে পড়ে। একটি সিংহমুখ যেন হা করে আছে। ডাল পালাগুলো ঝুলে আছে ঠিক কেশরের মত হুয়াংচু বললো—বনহুর এই যে সিংহ মুখ বৃক্ষ দেখতে পাচ্ছো এর মধ্যে রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ পথ। এ পথে তোমাকে যেতে হবে প্রায় অর্দ্ধ মাইল তারপর দেখবে তিনটা সুড়ঙ্গ মুখ একসঙ্গে রয়েছে তুমি মধ্যের পথ ধরে এগুবে তাহলেই তুমি তোমার উদ্দেশ্য সফলে সক্ষম হবে।

বনহুর অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো—সত্যি বলছো হুয়াংচু?

হাঁ, হুয়াংচু মিথ্যা বলে না। বনহুর আমি আমার এক শিষ্যের কাছেই জেনেছিলাম তোমার অদ্ভুত শক্তির কথা এবং সেই থেকেই আমি প্রতিক্ষা করছিলাম। তোমাকে পেলাম আশ্চর্যভাবে। বনহুর জানি যাদু বিদ্যা যা আমি সঞ্চয় করেছি প্রাকৃতিক শক্তির কাছ থেকে কিন্তু তোমার শক্তি অসীম। দৈহিক শক্তি ছাড়াও তুমি তেজদীপ্ত বুদ্ধিমান তুমি সর্বদিকে জ্ঞানী। ঐ সুড়ঙ্গ পথে তুমি যেখানে গিয়ে তিনটা মুখ দেখতে পাবে তার মধ্যের পথ ধরে এগিয়ে গেলে দেখবে পাশাপাশি কয়েকটা সুড়ঙ্গ মুখ। একেবারে সর্ব দক্ষিণে

যে সুড়ঙ্গ মুখ রয়েছে সেই সুড়ঙ্গ পথ চলে গেছে সোজা পাতাল পুরি হয়ে একদম চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে যেখানে রয়েছে রক্ত এবং চক্ষু ব্যাঙ্কের ডিপো। হামবার্টের অনুচর সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে থেকে হাজার হাজার লোককে খুন করে এই সব রক্ত আর চক্ষু সঞ্চয় করে এনে এখানে রেখেছে। ওরা জানে কেউ কোন দিন এর সন্ধান পাবে না।

হেসে উঠলো বনহুর তারপর বললো—যাদু সম্রাট তুমি যে রক্ত এবং চক্ষু ডিপোর সন্ধান আমাকে দিচ্ছো যে ডিপোর সন্ধান আমি অনেক পূর্বেই পেয়েছি। যখন আমি হোটেল পিউল পাং এ ছিলাম তখন চিংচু নামে এক শ্রমিকের ছদ্ম বেশে আমি সেখানে যাই এবং চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে সবকিছু জেনে নেই। তবে এ পথ পেয়ে ভালই হলো—ধন্যবাদ হুয়াংচু।

হুয়াংচু বললো—সুড়ঙ্গের শেষ মুখে দেখবে কয়েকটা মেশিন ঘর। আমি যাদু বিদ্যা নিয়ে কারবার করি তাই এ সব মেশিনের কিচ্ছু বুঝি না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এবং তোমার দরকার মত এগুলো ব্যবহার করতে পারবে!

বনহুর বলে উঠে—হুয়াংচু তুমি বড় বুদ্ধিমান। বেশ এবার আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। হামবার্টের নিকটে তোমাকে নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন মনে করছি না কারণ আমি নিজেই পারবো হামবার্ট এবং তার কু'কর্মের প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করতে।

হুয়াংচু বললো—কিন্তু যতক্ষণ তুমি ফিরে না আসবে ততক্ষণ আমি তোমার জন্য প্রতিক্ষা করবো।

তা তুমি করতে পারো হুয়াংচু।

হুয়াংচু এবার সিংহ মূর্তি বৃক্ষের ঝুলন্ত ডাল-পালার কিছু অংশ তার হস্তস্থিত অস্ত্রদ্বারা কেটে ফেললো। বিস্ময় নিয়ে দেখলো বনহুর অপরিস্কার একটি সুড়ংগ পথে গাছটার অভ্যন্তর চলে গেছে। সুড়ংগ মুখে অনেকগুলো মাকড়সার জাল জট পাকিয়ে আছে। না জানি ওর মধ্যে কি ভয়ঙ্কর ওৎ পেতে আছে কে জানে।

হুয়াংচু বললো—বনহুর কোন ভয় নেই তোমার। এই নাও এটা রক্ষা কবচের মত একটি অস্ত্র। এর দ্বারা তুমি যে কোন ভয়ঙ্কর জীব জন্তুকে হত্যা করতে পারবে এবং এর আলোতে তুমি পথ চলতে পারবে।

বনহুর হেসে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, এবার সে প্রবেশ করবে ঐ অদ্ভুত সুড়ংগ মধ্যে ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি বিরাট অজগর সেই সুড়ঙ্গ মধ্য হতে বেরিয়ে এলো।

বনহুর সংগে সংগে হুয়াংচুর দেওয়া অস্ত্রটা উদ্যত করে ধরলো।

হুয়াংচু বলে উঠলো—ওকে হত্যা করোনা বনহুর আমি ওকে কাবু করে ফেলেছি।

হুয়াংচু সাপটার গলার কাছে খপ্ করে ধরে ফেললো তারপর এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো সাপটা অল্পক্ষণের মধ্যেই কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েলো। ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়লো সাপটা যাদুকর হুয়াংচুর হাতের উপর।

বনহুর বললো—সাবাস হুয়াংচু তোমার যাদু বিদ্যাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বনহুর পর মুহূর্তেই প্রবেশ করলো সুড়ংগ মধ্যে।

জমকালো অন্ধকার।

হুয়াংচু যে অস্ত্রটা বনহুরকে দিয়েছিলো সেটা দিয়ে কিছু আলোর ছটা বের হচ্ছিলো সেই আলোর পথ দেখে এগুতে লাগলো বনহুর।

অদ্ভুত এ সুড়ংগ পথ।

দু'ধারে পাথুরে দেয়াল, কিন্তু উপরিভাগ হতে বহু শিঁকড় ঝুলে পড়েছে সুড়ংগ মধ্যে। মাঝে মাঝে পথ বন্ধ করে দিয়েছে শিকড়গুলো।

বনহুর সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে।

কোন কোন জায়গায় একেবারে পথ বন্ধ।

বনহুর হুয়াংচুর দেওয়া অস্ত্রের দ্বারা শিকড় কেটে পথ তৈরি করে নিচ্ছিলো।

সুড়ংগ পথে বহুদিন পৃথিবীর কোন আলো বাতাস প্রবেশ না করায় ভিতরে একটা চাপা গুমটো ভাব বিরাজ করছিলো। বনহুরের সমস্ত দেহ ঘামে ভিজে চুপসে উঠলো।

❑

ফাংফা বহু সন্ধান করেও খুঁজে পেলোনা বনহুরকে।

হামবার্ট অগ্নি বর্ণ ধারণ করে ফাংফাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলো তারপর ওকে হত্যা করলো নির্মমভাবে যেমন হত্যা করেছিলো চিংচুকে।

হামবার্টের চিন্তা নিশ্চয়ই কেউ গোপনে তার চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের গোপন কেন্দ্রগুলির সন্ধান নিয়ে গেছে। যে ভুল ফাংফা করেছিলো তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড হলেও হামবার্ট নিশ্চিন্ত হলোনা। যেন নিজে তার অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে খোঁজ করে চললো।

যদিও হামবার্ট এ ব্যাপারে চিন্তিত ছিলো তবু তাদের ব্যবসার কাজ বন্ধ ছিলোনা। বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে বাক্স বাক্স তাজা রক্ত আর সজিব চক্ষু। নানা দিক দিয়ে গোপন পথে এসব চলে আসছে হামবার্টের চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে রক্ত এবং চক্ষু ব্যাঙ্ক ডিপোতে।

তারপর এখন থেকে এসব চক্ষু এবং রক্ত ব্যাঙ্ক বাক্সগুলো সুড়ংগ পথে চালান যায় বিদেশে। হামবার্ট শুধু ধনী নয় সে ধন কুবেরু। কোটি কোটি টাকা তার আয়।

অবশ্য হামবার্টের একজন অংশীদার রয়েছে নাম তার সাংমাসিও সে অত্যন্ত বদরাগী এবং শয়তান, তবে হামবার্টের মত সুচতুর নয়। সাংমাসিওকে ভুলিয়ে হামবার্ট যা খুশি তাই সে করে যায়। কান্দাই দস্যু বনহুরের কাছে মার খেয়ে পালিয়ে এসে সে সাংমাসিওর কাছে নানা কথা বানিয়ে বলেছে। দস্যু বনহুর তাদের ব্যবসায় অংশীদার হিসাবে আসতে চেয়েছিলো কিন্তু তাকে গ্রহণ না করায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের কান্দাই জঙ্গল বাড়ি ঘাটি আক্রমণ করেছিলো। হামবার্ট আরও বলে দস্যু বনহুরকে হত্যা করার জন্যই আমি জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করে ফেলি।

সাংমাসিও বিশ্বাস করে হামবার্টের কথা, কতকটা সে আশ্বস্ত হয় যাক জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করেও যদি এতো বড় এক শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সে কারণেই সাংমাসিও নিশ্চিন্ত ছিলো দিব্যি আরামে।

হামবার্ট যে দস্যু বনহুরের কাছে চরমভাবে মার খেয়ে জিহাংহায় পালিয়ে এসেছে এ কথা জানতো না সে।

সাংমাসিও কোন সময় বাহিরে যেতো না সে সব সময় চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে তাদের আসল ঘাটীতে থাকতো। হামবার্ট এক চক্ষুহীন এবং এক পা খোঁড়া হলেও সে বিচরণ করতো সারা পৃথিবীময়। তার অদ্ভুত আকাশ যানে সে ইচ্ছা মত সব জায়গায় যাওয়া আসা করতো।

সম্প্রতি বনহুরের সন্ধানে সে কান্দাই যাওয়া মনস্থ করে নিয়েছে এবং সে যাদুকর হুয়াংচুকে অন্বেষণ করে ফিরছে। হুয়াংচু দ্বারা হামবার্ট হত্যা করবে দস্যু বনহুরকে তাই তার এতো প্রচেষ্টা।

হামবার্ট এবং সাংমাসিও মিলে আলোচনা হচ্ছিলো। দু'জন বসেছিলো দুটো আসনে। তাদের পিছনে ছিলো চক্রাকারে বিরাট আকার কয়েকটা মেশিন। এ মেশিনগুলো কতকটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ মেশিনের মত দেখতে। এগুলো ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। আসলে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের বদ্ধ বাতাস বের করে পৃথিবীর সচ্ছ বাতাস টেনে আনছে এ মেশিনগুলো।

আরও কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত মেশিন রয়েছে যে সব মেশিন কেউ কোনদিন দেখেনি। ওদিকে কতকগুলো গ্যাস পাইপ, কোন কোন জায়গায় গ্যাস পাইপগুলো বেলুনের মত মোটা হয়ে গেছে। এ স্থানে অনেকগুলো সুইচ এবং মিটার সাজানো রয়েছে। কতকগুলো গ্যাস পাইপ এসে সংযোগ হয়েছে পাশের একটি দেয়ালের সঙ্গে।

যে কক্ষের দেয়ালে গ্যাস পাইপগুলো এসে সংযোগ হয়েছে সেই কক্ষটি হলো চক্ষু রক্ষা ব্যাঙ্ক। এখানে লাখ লাখ মানুষের দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট করে তাদের চোখগুলো উপড়ে এনে রাখা হয়েছে। বিরাট বিরাট কাঁচের জারের মধ্যে অগণিত চোখ থরে থরে সাজানো, পাশেই রক্ত রক্ষাকারক ব্যাঙ্ক। এ কক্ষের মধ্যেও নানা রকম গ্যাস পাইপ এবং মেশিন পত্র রয়েছে। বড় বড় কাঁচ পাত্রে তাজা লাল টকটকে রক্ত; কত অসহায় মানুষের বুকের রক্ত যে এখানে জমা করে রাখা হয়েছে তার কোন হিসাব নাই।

অদ্ভুত এ চীন প্রাচীরের অভ্যন্তর।

কথা হচ্ছিলো হামবার্ট এবং মাংমাসিও।

মাংমাসিও বলছিলো—হামবার্ট তুমি যাই বলো; আমাদের এ চীন প্রাচীরের অভ্যন্তর ঘাটির সন্ধান কেউ কোন দিন পাবে না তুমি মিছা মিছি চিন্তিত হচ্ছো।

হামবার্ট বলে উঠলো—মাংমাসিও চিংচু বেশে যে আমাদের চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলো যে সাধারণ লোক নয়। কারণ আমার চোখকে ধূলো দেওয়া এ কম কথা মনে করো। ফাংফাকে হত্যা করেছি হত্যা করেছি তার সঙ্গী সাথী সবাইকে। চিংচু যে হোটেলে থাকে সে হোটেলের সবাইকে খুন করবো।

এতে কি লাভ হবে হামবার্ট?

লাভ এ হোটেলের খদ্দেরদের কেউ চিংচুর ছদ্মবেশে এসেছিলো কিন্তু কে যে যার এতো বড় সাহস।

হামবার্ট তুমি হোটেলের খদ্দেরদের হত্যা করে কোন ফল পাবে না। কারণ যে ব্যক্তি চিংচুর ছদ্মবেশে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলো সে নিশ্চয়ই ঐ হোটেলে থাকেনা কারণ যে জানে তুমি সর্বক্ষণ ঐ হোটেলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

ঠিক বলেছো মাংমাসিও সে কোন দন্ডে ঐ হোটেলে আসতে পারেনা। হাঁ, আমি শুনেছি যে ঐ হোটেলে ছিল যে হোটেলের মালিকের মেয়ে হুংমার সঙ্গে খুব মেলামেশা করতো ওর সঙ্গে নাকি ভাবছিলো হু, হুংমাকে ধরে ওর মুখে জেনে নিতে হবে কে সে? হাতে তালি দিলো হামবার্ট।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক কক্ষে প্রবেশ করলো।

হামবার্ট তাদের লক্ষ্য করে বললো—পিউলপাং হোটেলের মালিক কন্যা হুংমাকে তোমরা কেউ চেনো?

একজন বললো—চিনিনা তবে চিনে নিতে পারবো হুজুর।

বেশ যাও হুংমাকে তোমরা ধরে নিয়ে এসে তারই কাছে জেনে নিতে পারবে কে সে এবং এখন সে কোথায় আছে যে চিংচুর বেশে ফাংফার চোখে ধুলো দিয়ে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে আমাদের এই ঘাটিতে প্রবেশ করে সব জেনে নিয়ে গেছে। শুধু ফাংফাকেই ঠকায়নি লোকটা ঠকিয়েছে আমাকে। মাংমাসিও ইচ্ছা হয় নিজের চোখ দুটোকে নষ্ট করে ফেলি।

মাংমাসিও বলে উঠে—তুমি লক্ষ লক্ষ লোকের চোখ নষ্ট করে ফেলেছো একদিন তোমাকেও এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

চুপ করো মাংমাসিও এটা শুধু আমার স্বার্থের জন্য নয় এতে তোমার স্বার্থ আমার চেয়ে কম নয় তা ছাড়া আমাদের সমস্ত কোম্পানী রয়েছে.....

যাক্ তুমি আদেশ করো তোমার সম্মুখে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে।

হামবার্ট বললো—হাঁ যাও তোমরা হুংমাকে ধরে নিয়ে এসো যেন কেউ টের না পায়।

চলে গেলো লোক দু'জন।

হামবার্ট এবং মাংমাসিও নিজেদের কথা বার্তায় মনোযোগ দিলো।

❑

হুংমা হোটেলের খদ্দেরদের সঙ্গে হাসি গল্প করলেও কেমন যেন একটা বিষণ্ন ভাব সদা সর্বদা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায় সে প্রায়ই। তখন হুংমা নির্জনে গিয়ে বসে থাকে, কারো সঙ্গে তেমন প্রাণ খুলে কথা বলেনা।

এ ব্যাপার নিয়ে হুংমার বাবা প্রাই হুংমার সাথে অসৎ আচরণ করে থাকে। হুংমা বাপের কথায় দুঃখ পায় কিন্তু কোন উত্তর দেয় না। রাজা ছিলো হুংমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হঠাৎ তাকে হারিয়ে হুংমা যেন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। মাদামচীং তাকে নিয়ে গেছে সে আর কোন দিন ফিরে আসবে একথা হুংমা ভাবতে পারে না।

সেদিন হুংমা বসেছিলো হোটেল পিউল পাং এর রেলিং এর ধারে হয়তো বা ভাবছিলো সে একটি পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ মুখের কথা। ভাবছিলো তার সঙ্গে কতকগুলো দিনের কথা। ভাবছিলো কতকগুলো স্মৃতি বিজড়িত মুখের কথা।

এমন সময় একটি গাড়ি এসে থামলো হোটেলের সম্মুখে।

গাড়ি থেকে নামলো দু'জন লোক।

হোটেলের বয় তাদের জন্য দরজা খুলে ধরলো।

ওরা দু'জন প্রবেশ করলো হোটেলের মধ্যে।

হুংমার দৃষ্টি এ দুটি লোককে এক নজরে বুলিয়ে নিলো কিন্তু সে তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালো না। হুংমার বাবা কন্যার উদাসীন ভাব লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ হলো। নিজে সে হুংমাকে ডেকে বললো—হুংমা খদ্দের এসেছে তুমি তাদের প্রতি খেয়াল দিচ্ছো না কেনো।

হুংমা বললো—দেখতে পাইনি বাবা।

অবশ্য মিথ্যা বললো হুংমা তাতে কোন সন্দেহ নাই।

এবার হুংমা উঠে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

লোক দু'জন ততক্ষণে হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করেছে।

হুংমা সিঁড়ি বেয়ে নামতেই ওরা তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো ওর দিকে। চাপা গলায় বললো একজন—এই হলো হুংমা।

অপর জন বললো—মেয়েটি সুন্দরী বটে।

হাঁ মিথ্যে নয়।

যাকে ও এতো ভাল বাসতো সে নিশ্চয়ই ওর মনের মত ছিলো।

কথাবার্তার ফাঁকে আড় নয়নে তাকিয়ে দেখে নিলো ওরা হুংমাকে।

হুংমা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। লম্বা-গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়েছে ওদের। মাথায় অদ্ভুত টুপি দু'জনার মুখেই লম্বাটে সরু দাঁড়ি আছে। হুংমা হেসে উঠলো ওদের দেখে খিল খিল করে তারপর বললো, কি খাবে তোমরা?

দু'জনের মধ্যে একজন খাবার ওর্ডার দিল।

হুংমা একটা কাগজ কলম নিয়ে লিখে নিলো ওর্ডারগুলো তারপর বয়কে ডেকে কাগজখানা ওর হাতে দিয়ে বললো—এ সব খাবার নিয়ে এসো।

বয় কাগজ হাতে চলে গেলো।

হুংমা লোক দু'জনের চেহারা দেখতে লাগলো অবাক চোখে।

এমন সময় খাবার দিয়ে গেলো বয়।

হুংমা টেবিলে খাবারগুলো গুছিয়ে রাখছিলো। এটা তার কাজ। হোটেলের খদ্দেরদের মনোতুষ্টির কারণেই হুংমা এ সব কাজ করতো।

খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখতেই ওরা দু'জন খেতে শুরু করলো।

ওরা দু'জন খেতে খেতে মাঝে মাঝে হুংমার দিকে কিছু খাবার এগিয়ে দিচ্ছিলো। হুংমা বিনা দ্বিধায় খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেধে উঠেছে।

জিহাংহার পথ ঘাটে বিজলী বাতিগুলো জ্বলে উঠলো। পিউল পাং হোটেলের মধ্যেও আলো জ্বললো।

হোটেলের নতুন আগন্তুক খদ্দেরদ্বয় এর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় একজন পকেট থেকে একটা লাল টকটকে আপেল ফল বের করে হুংমার হাতে দেয়।

হুংমার চোখ দুটো খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠলো, সে ফল হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খেতে শুরু করলো কিন্তু কয়েক কামড় খেয়েছে অমনি হুংমার দেহটা ঢলে পড়ে পাশের চেয়ারে।

লোক দু'জন চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নেয় আশে পাশে কেউ নেই, একজন হুংমার মাথার অংশে আর একজন পায়ের দিকে। হোটেলের বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো ওরা দু'জন হুংমার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নেয় গাড়িতে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে হুংমার-বাবা উপর থেকে দেখে ফেলে চিৎকার শুরু করে দেয় কিন্তু ততক্ষণে—হুংমাসহ খদ্দের দু'জন গাড়ি চালিয়ে উল্কা বেগে পালিয়ে যায়।

হুংমার বাবার চিৎকারে হোটেলের লোকজন সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ালো তার চার পাশে। সবার চোখে মুখে বিস্ময় ভাব কি হলো কি হলো।

হুংমার বাবা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে, সে ভাবতেও পারেনি যে তারই হোটেলের কোন খদ্দের তারই মেয়েকে নিয়ে পালাবে। আংগুল দিয়ে হুংমার বাবা শুধু দেখিয়ে দিলো, যে পথে ওরা হুংমাকে নিয়ে ভেগেছে।

কয়েকজন ছুটলো কিন্তু কোথায় তখন ওরা।

কেউ কেউ পুলিশ অফিসে ফোন করলো, অল্পক্ষণে পুলিশ এলো কিন্তু কে কোথায় কারা হুংমাকে নিয়ে কোন পথে কোথায় চলে গেছে বলতে পারলো না কেউ।

হুংমাকে নিয়ে গাড়িখানা এলো পাথারী ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে সে জন্যক জীপ গাড়িখানার চার পাশে খড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এক সময় জিহাংহার শহর ছেড়ে জঙ্গল পথ ধরে ছুটলো গাড়িখানা তারপর এক সময় নির্জন প্রান্তরে এসে থামলো।

সেই লাইট পোষ্ট আলোক স্তম্ভ।

একজন জীপ থেকে নেমে লাইট পোষ্টের গায়ে সুইচ টিপলো সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো একটা সুড়ঙ্গ পথ। এবার লোক দু'জনের মধ্যে একজন তুলে নিলো হুংমার সংজ্ঞাহীন দেহটা আল গোছে কাঁধের উপর।

প্রথম ব্যক্তি অবাক কণ্ঠে বললো—জাংচি-তুই তো বেশ শক্তি গায়ে রাখিস; একই মেয়েটাকে কাঁধে তুলে নিলি।

জাংচি জিলুংয়াং এর কথায় কান না দিয়ে পা বাড়ালো সুড়ঙ্গ পথের দিকে।

জিলুংয়াং ও তাকে অনুসরণ করলো।

সুড়ঙ্গ পথে কিছুটা অগ্রসর হবার পর তারা লিফ্‌টে চেপে বসলো। হুংমা তখনও সংজ্ঞাহীন। হুংমার সংজ্ঞাহীন দেহটা জাংচির কাঁধেই রয়েছে।

জাংচি দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্বিকার ভাবে।

এক সময় তারা হুংমা সহ পৌঁছে গেলো চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে।

হামবার্ট তার নিজস্ব বিশ্রামকক্ষে বসে বিশ্রাম করছিলো। একজন গিয়ে সংবাদ দিলো, পিংপা হোটেলের মালিক কন্যা হুংমাকে আমরা চুরি করে আনতে অক্ষম হয়েছি।

হামবার্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললো—তোমরা আজও কথা বলতে শিখলেনা জিলুংয়াং। বলতে পারোনা যে হুংমাকে আমরা পাকড়াও করে এনেছি। একটা মেয়েকে চুরি করে এনে বাহাদুরী করছো। চলো দেখি কোথায় সেই হুংমা!

মালিক সে এখনও অজ্ঞান আছে।

অজ্ঞান।

হাঁ মালিক, তাকে আপেলের মধ্যে সংজ্ঞাহীনের ঔষধ পুশ করে খাইয়ে দিয়েছিলাম।

একটা মেয়েকে তোমরা জ্ঞান সম্পূর্ণ অবস্থায় ধরে আনতে পারলেনা এমন অপদার্থ লোক। যাও যখন ওর জ্ঞান ফিরে আসবে তখন ডাকবে। কিন্তু সাবধান সে যেন জানতে না পারে কোথায় আছে। যাও জিলুংয়াং।

জিলুংয়াং চলে গেলো।

জাংচি ততক্ষণে হুংমাকে নিয়ে একটি ভাল বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর সংজ্ঞা ফেরানোর চেষ্টা করছিলো।

জিলুংয়াং এসে এ দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে জাংচি তুই দেখছি ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছিস।

জাংচি চোখ তুলে তাকায় জিলুংয়াং মুখে কি বললি আমি মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছি।

হাঁ কতকটা তাই মনে হচ্ছে কারণ ওকে একাই কাঁধে করে বয়ে আনলি আবার ওকে এনে ভাল বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যত্ন শুরু করে দিয়েছিস।

জাংচি একটু হেসে বললো—প্রেম-ট্রেম কিছু নয় তবে ও একটা মানুষ তো তাই...

বড্ড দয়া জন্মেছে তোর মধ্যে দেখছি। জানিস মালিক বলেছে আমার অনুচরদের মধ্যে কোন সময় দয়া বা সহানুভূতি থাকবে না।

তাহলে কি তুই মেয়েটাকে মেরে ফেলতে বলিস।

মেরে ফেলবি কেনো যেমন এনেছিস তেমনি ফেলে রাখ যখন হোক ওর জ্ঞান ফিরে আসবে।

ঠিক ঐ সময় হুংমা একটু নড়ে উঠে তারপর বলে—জল আমাকে দাও...বাবা জল দাও...

জাংচি বললো—জিলুংয়াং যা তো এক ঘটি জল নিয়ে আয়।

মুখ ভেংচে বললো জিলুংয়াং—জানিস না কোন বন্দীকে জল খেতে দেওয়া হয়না।

রেখেদে দেখছিস না মেয়েটার ঠোঁট দু'খানা শুকিয়ে গেছে।

ও বুঝেছি সুন্দরী বলে ওকে মনে ধরেছে তাই না।

চুপ কর জিলুংয়াং যাতা বলিস না, আমি নিজে গিয়ে ওকে পানি এনে দেবো। জাংচি চলে যায় এবং এক গেলাস পানি নিয়ে ফিরে আসে। হুংমার মাথাটা উঁচু করে ওকে খাইয়ে দেয় পানিটুকু তারপর বলে চুপ করে শুয়ে থাকো।

হুংমা বলে উঠে—না আমি শোবনা, বলো আমি কোথায়? এটা তো আমার বাড়ি বা হোটেল নয়।

জিলুংয়াং দাঁত মুখ খিঁচে বলে—এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি। চুপ করে শুয়ে থাকো একটু পরে সব টের পাবে।

তোমরা কে? তোমরা দেখছি আমাদের হোটেলের সেই খদ্দের বললো হুংমা।

হাঁ ঠিক চিনতে পেরেছো তা হলো। বললো জাংচি।

জিলুংয়াং কিছু বলতে যাচ্ছিলো বাধা দিয়ে বলে উঠলো হুংমা—তোমরাই তা হলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো? বলো কেনো তোমরা আমাকে এখানে এনেছো বলো কেনো?

জাংচি বললো—তোমাকে আমাদের প্রয়োজন তাই এনেছি। একটু সবুর করো সব জানতে পারবে।

হুংমা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠে, কারণ সে মোটেই শান্ত মেয়ে ছিলোনা। চঞ্চলভাবে উঠে দাঁড়ায় জোর কণ্ঠে বলে—বলবে না তোমরা আমাকে কেনো এখানে এনেছো? কোন অধিকারে এনেছো বলো...হুংমা জিলুংয়াং এর মুখের দাঁড়ি চেপে ধরে ভীষণভাবে।

জিলুংয়াং তো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে।

জাংচি দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিলো। হুংমার কাছে জিলুংয়াং এর নাজেহাল অবস্থা দেখে সে হাসছিলো মৃদু মৃদু।

হুংমার কাছ থেকে জিলুংয়াং তার লম্বা দাঁড়ি ছাড়িয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু হুংমা নাছোড়বান্দা।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হলো হামবার্ট। তার খোড়া পায়ে ভারী বুটের অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিলো। হুংমা ফিরে তাকাতেই জিলুংয়াং ওর হাত দু'খানা থেকে দাঁড়ি গুচ্ছ মুক্ত করে নেয়।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে হুংমা।

জিলুংয়াং মরিয়া হয়ে উঠেছিলো সে আংগুল দিয়ে নিজের দাঁড়ি থেকে ছেড়া দাঁড়িগুলো বের করে ফেলছিলো আর যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছিলো।

হামবার্ট এসে দাঁড়ালো, যেন একটা সাক্ষাৎ যমদূত। হুংমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখেনিলো তীক্ষ্ণ নজরে।

হুংমাও তাকিয়েছিলো এক দৃষ্টিতে হামবার্টের চেহারার দিকে।

হামবার্ট বললো এবার কর্কশ কণ্ঠে—এরি নাম হুংমা?

জিলুংয়াং তখনও যন্ত্রণায় কাতর তাই জবাব দিলো জাংচি—হাঁ মালিক এরি নাম হুংমা এবং সে হোটেল পিউল পাং এর মালিকের মেয়ে।

অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো হামবার্ট—তাই তো হোটেল পিউল পাং এতো খদ্দের। হুংমা জানো আমিই তোমাকে এখানে ধরে আনিয়াছি।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো হুংমা—তোমার চেহারা শয়তানের মত তাই তোমার কাজও জঘন্য। আমাকে তুমি কেনো ধরে আনিয়াছো? আর তুমিই না কো?

আমি যেই হইনা কেনো পরিচয় তোমার দরকার নেই। তোমাকে কেনো এনেছি সেই কথা বলছি শোন।

হুংমার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বের হচ্ছে। তাকিয়ে আছে সে এক দৃষ্টে হামবার্টের মুখের দিকে।

হামবার্ট বললো—সুন্দরী মেয়েকে টোপ রেখে তোমার বাবা হোটেলে অনেক খদ্দের জোগাড় করে। বলো রাজা কে আর সে গেলো কোথায়?

হুংমা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, রাজা!

হাঁ রাজা যে চিংচুর ছদ্মবেশে আমার গোপন ঘাটিতে প্রবেশ করেছিলো।

হুংমা ধীরে ধীরে আপন মনে উচ্চারণ করে—রাজা চিংচুর ছদ্মবেশে তোমার গোপন ঘাটিতে প্রবেশ করেছিলো?

হাঁ। সে যে অপরাধ করেছে তার জন্য তাকে আমি আমার যাঁতাকলে নিষ্পেষণ করবো। তারজন্য আমি আমার অভিজ্ঞ সহকারী ফাংফাকে হত্যা করেছি হত্যা করেছি আরোও অনেককে। যদি রাজার সন্ধান না দাও তবে হত্যা করবো তোমাকে। কথাগুলো বলে থামলো হামবার্ট।

হুংমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, রাজার জন্য সে নিজেই পাগল। রাজাকে সে নিজেই অহঃরহ খুঁজে ফিরছে কোথায় পাবে সে রাজাকে। রাজা তো হারিয়ে গেছে তার কাছ থেকে।

হুংমাকে ভাবতে দেখে বললো হামবার্ট—কোন রকম চালাকী করতে যেওনা হুংমা, আমার কাছে চালাকী চলবেনা সত্যি কথা বলবে।

হুংমা এবার হাতের পিঠে চোখ মুছে বললো—রাজাকে মিনা বাজারে হারিয়েছি।

রাজাকে মিনা বাজারে হারিয়েছো! এ সব কি বলছো হুংমা?

সত্যি।

মিথ্যে কথা। একটা জীবন্ত মানুষ হারিয়ে গেছে এ কথা তোমার হোটেলের লোকেরা বিশ্বাস করতে পারে কিন্তু আমি করতে পারিনা।

হুংমা মিথ্যা বলে না শয়তান। জানি না তুমি কে। তুমি রাজাকে খুঁজছো আমিও খুঁজছি তাকে। রাজাকে যদি এনে দিতে পারো যা চাও তাই দেবো আমি তোমাকে। পারবে তুমি রাজাকে এনে দিতে?

তোমার অভিনয় আমাকে ভোলাতে পারবেনা হুংমা। বলো সে কোথায়?

হাঁ আমি তার সন্ধান জানি কিন্তু যদি শপথ করো রাজাকে তুমি এনে দেবে তাহলে আমি বলবো কোথায় আছে সে।

হামবার্ট একবার নিজের সঙ্গী দু'জনার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো তারপর বললো বেশ শপথ করছি বলো সে কোথায়?

হুংমা বললো—একদিন রাজাকে সঙ্গে করে বাজারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে নিয়ে একটা দোকানে জিনিস কিনছি ঐ সময় যাদু সম্রাটের কন্যা মাদামচীং তার রথে চেপে মিনা বাজারে আসে এবং সে রাজাকে দেখে তুলে নিয়ে যায় সেইদিন থেকে আমি তাকে খুঁজে ফিরছি। তুমি যদি পারো রাজাকে এনে দিও। যা চাও আমি তাই দেবো তোমাকে.....

হামবার্টের দৃষ্টি ধীরে ধীরে হুংমার মুখ থেকে সরে এলো, তাকালো সে সম্মুখের দিকে আপন মনে বললো—রাজাকে মাদামচীং তার রথে তুলে নিয়ে গেছে.....সে এখন তা'হলে যাদু সম্রাট কন্যা মাদামচীং এর প্রাসাদের আমোদ প্রমোদে মত্ত। অট্ট হাসিতে ভেঙে পড়ে হামবার্ট ফিরে তাকায় সে জাংচি আর জিলুংয়াং এর মুখে, কঠিন কণ্ঠে বলে জিলুংয়াং হুংমাকে বন্দী করে রাখোগে যতদিন আমি রাজাকে খুঁজে না পাই বা মাদামচীং-এর কাছে সে সত্যি আছে কিনা জানতে না পারি ততদিন সে বন্দী থাকবে। যদি সে মিথ্যা বলে থাকে তা হলে আমি হুংমাকে যাতা মেশিনে পিষে ওকে মাংস পিন্ডে পরিণত করবো যা রাজাকে পেলে করতে চাই সেই শাস্তি আমি দেবো হুংমাকে। আর জাংচি তুমি আয়োজন করো এই মুহূর্তে আমি যাদুকর কন্যা মাদামচীং এর প্রাসাদ উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো।

জিলুংয়াং বলে উঠলো—মালিক জাংচি হুংমাকে নিয়ে বন্দী করে রাখুক আমি যাবো আপনার সঙ্গে।

বেশ তাই চলো। বললো হামবার্ট।

জাংচি হুংমাকে নিয়ে চলে গেলো।

হামবার্ট বললো—জিলুংয়াং চলো আমি মাদামচীং এর সঙ্গে দেখা করবো এবং রাজাকে পাকড়াও করে এনে হত্যা করবো।

জিলুংয়াং বললো—কিন্তু মালিক.....

কি বলো থামলে কেনো?

মাদামচীং এর সঙ্গে দেখা করা সহজ নয় মালিক।

তোমাদের কোন কথা আমি শুনতে চাইনা, চলো।

কিন্তু.....

কিন্তু কি?

পথ যে আমি চিনিনা মালিক।

হতভাগা কোথাকার। যাও দেখো কে মাদামচীং-এর প্রাসাদের পথ চেনে তাকে নিয়ে এসো।

বেরিয়ে যায় জিলুংয়াং।

হামবার্ট পায়চারী শুরু করে।

কিছুক্ষণ পর জাংচি সহ ফিরে আসে জিলুংয়াং বলে সে মালিক জাংচি বলছে সে মাদামচীং এর প্রাসাদের পথে চেনে।

হামবার্ট বলে উঠে—তুমি চেনো জাংচি?

হাঁ মালিক চিনি।

তবে তোমরা দু'জনই চলো আমার সঙ্গে।

মালিক আমি পথের নির্দেশ দিচ্ছি আপনি চলুন।

হামবার্ট জাংচি এবং জিলুংয়াং সহ রওয়ানা দিলো।

রওয়ানা দেবার আগে বললো হামবার্ট—হুংমাকে ভালভাবে আটক করে রেখেছো তো?

হাঁ মালিক রেখেছি। বললো জাংচি।

অন্ধকার কক্ষে হুংমাকে বন্দী করে রাখা হলো। সে বন্দী সিংহীর মত কিছুক্ষণ রাগে দুংখে নিজের মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়তে লাগলো।

ঐ যে পর্বতমালা দেখছেন ওখানে একটা প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে ওটাই হলো মাদামচীং-এর বিশ্রামাগার। আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো জাংচি।

হামবার্ট তার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। জিলুংয়াংও নেমে দাঁড়ালো তার সঙ্গে।

হামবার্ট বললো—তোমরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করো আমি একাই যাবো মাদামচীং-এর সঙ্গে দেখা করতে।

কথা কয়টি বলে হামবার্ট রওয়ানা দিলো।

জাংচি আর জিলুংয়াং বসে রইলো গাড়ির মধ্যে।

হামবার্টের এক পা খোড়া হলে কি হবে তার চলন শক্তি ছিলো অতিদ্রুত কাজেই অল্পক্ষণেই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো সে।

জাংচি আর জিলুংয়াং গাড়িতে বসে গল্প জুড়ে দিলো।

এক মিনিট দু'মিনিট করে চললো ঘন্টার পর ঘন্টা হামবার্টের ফিরার কোন কথা নাই।

জিলুংয়াং বললো—জাংচি তোর কথা যদি মিথ্যা হয় তা'হলে মালিক তোকে হত্যা না করে ছাড়বেনা।

জাংচির মুখখানা শুকিয়ে গেলো, তাই তো সে সঠিক কিছু জানে না। লোকের মুখে সে শুনেছে ঐ পর্বত মালার উপরে যে প্রাসাদ দেখা যায় ঐখানে নাকি থাকে মাদামচীং। যদি হামবার্ট গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে তাহলে তাকে নির্মম মৃত্যুবরণ করতে হবে তাতে কোন ভুল নাই। ঢোক গিলে বলে জাংচি—ভাই জিলুংয়াং মালিককে আমি মিথ্যা বলিনি তবে যদি হঠাৎ মিথ্যা হয়ে যায় তা হলে আমাকে মরতে হবে যে?

জিলুংয়াং বলে—তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবেই তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবি।

এখানে যখন জিলুংয়াং এবং জাংচির কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন হামবার্ট প্রায় মাদামচীং এর প্রাসাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। মাদামচীং চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখে নিয়ে সহচরদের বলে— দেখো একটি লোক আমার প্রাসাদের দিকে আসছে ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন অনুচর ছুটলো।

হামবার্ট এগুতে এগুতে কিছুটা হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে একটা পাইপ বৃক্ষের নিচে বসে পড়লো। হামবার্টের মনে হলো এ ব্যাপারে সে নিজে এসে ভুল করেছে কারণ তার অনুচরের তো অভাব নেই হুকুম করলেই রাজাকে তারা পাকড়াও করে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু শুধু রাজাকে পাকড়াও করাই তার মূল উদ্দেশ্য নয় তার উদ্দেশ্য মাদামচীং এর সঙ্গে মোলাকাত করা এবং সেই কারণেই হামবার্ট এসেছে এখানে.....

হামবার্টের চিন্তা ধারায় বাধা পড়ে অনুচরদ্বয় এসে দাঁড়ায়, দুজনের হাতে দু'টো আগ্নেয় অস্ত্র।

হামবার্ট অবাক হয়না কারণ সে জানে এমন অবস্থায় তাকে পড়তে হবে তাই সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—কে তোমরা?

মাদামচীং এর একজন অনুচর দু'জনের হয়ে জবাব দেয়—আমরা যাদুকরী মাদামচীং এর অনুচর।

হামবার্ট বলে উঠে—! তোমরা কি চাও?

তুমি মাদামচীং এর প্রাসাদ অভিমুখে কেনো অগ্রসর হচ্ছো জানতে চাই? কথা কয়টি বললো একজন।

অপরজন বললো—জানোনা এ পথে অগ্রসর হলে সে আর ফিরে যেতে পারে না।

হামবার্ট এর মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠলো, বললো যে—তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও?

হাঁ, যদি মঙ্গল চাও তবে ফিরে যাও।

যদি না যাই?

মরবে।

জানো তোমাদের হাতে যে অস্ত্র, ও অস্ত্র আমার কিছুই করতে পারবে না। আমার দেহে বুলেটের আঘাতে ক্ষত হয় না। কাজেই তোমরা আমাকে হত্যা করতে পারবে না। বরং তোমরা যদি আমার হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও তবে আমি যে প্রশ্ন করবো তার জবাব দাও।

হামবার্ট কথাগুলো বলে থামলো।

অনুচরদের একজন বললো—বলো তোমার কি প্রশ্ন? যদি সন্তোষজনক হয় তবে রক্ষা পাবে, না হলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য। মাদামচীং তোমাকে রেহাই দেবেনা। বলো তুমি কি জন্য এ পথে অগ্রসর হয়েছো?

হামবার্ট মনে করে যদি এদের দু'জনাকে ফুসলিয়ে জেনে নেওয়া যায় তা হলে হয়তো রাজাকে পাকড়াও করা অত্যন্ত সহজ হবে। তাই সে বললো—তোমরা যদি আমাকে হত্যা উদ্দেশ্যেই এসে থাকো তবে আমার একটা কথার জবাব দাও?

বলো কি জানতে চাও? —বললো প্রথম জন।

হামবার্ট বললো—মাদামচীং যে একটি যুবককে মিনাবাজার থেকে তুলে এনেছিলো সে যুবক এখন কোথায় যদি বলো তাহলে...

দ্বিতীয় জন বলে উঠে—মাদামচীংও তাকে খুঁজে ফিরছে কারণ যাদু সম্রাট তাকে হীমাগারে আটকে রেখেছে।

হীমাগার। নামটা উচ্চারণ করলো হামবার্ট।

প্রথম জন বললো—তুমি কোন জায়গা থেকে এসেছো হীমাগারের নাম শোননি। যাদুকর হুয়াংচুর হীমাগার কেউ কোন দিন স্পর্শ করতে পারে না। একবার নয় সাতবার মাদামচীং এর গুপ্ত অনুচর হীমাগারের ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিলো তারা কেউ আর ফিরে আসেনি।

হামবার্ট বললো— রাজাকে নিয়ে আমার জন্যই কি মাদামচীং চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলতে চাও?

হাঁ। রাজাকে পাবার জন্য মাদামচীং উন্মাদ প্রায়! এতোগুলো গুপ্তচর প্রাণ হারালো তবু সে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যেমন করে হোক ঐ যুবকটিকে তার চাই।

বলো কি?

হাঁ।

হামবার্টের ললাটে চিন্তা রেখা ফুটে উঠলো, তাই তো হীমাগার থেকে রাজাকে বের করে আনা যখন এতো কঠিন তাহলে ওর সম্বন্ধে আর ভেবে লাভ নাই।

হামবার্ট ফিরে চললো যেখানে সে গাড়ি রেখে এসেছিলো সেখানে।

মাদামচীং এর অনুচরগণ ফিরে চললো এবং মাদামচীংকে গিয়ে জানালো লোকটা রাজার সন্ধানে আপনার এখানে আসছিলো। রাজা আপনার এখানে নেই জেনে সে ফিরে গেছে।

মাদামচীং এর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, সে নিজ মনেই বললো—রাজাকে হীমাগার থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই। সাতবার চেষ্টা চালিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। সাতবারে আমার সত্তর জন গুপ্তচর নিহত হয়েছে...অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে মাদামচীং—এরপর আমি নিজে যাবো হীমাগারে।

হামবার্ট ফিরে চললো তার আস্তানার উদ্দেশ্যে।

জাংচি এবং জিলুংয়াং মনে মনে খুশি হলো যা হোক রাজার ব্যাপার নিয়ে হামবার্ট আর মাথা ঘামাবেনা।

ফিরে এসে বললো জাংচি—মালিক হুংমাকে কি তার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবো?

ওর জন্য তোমার এতো মাথা ব্যথা কেনো? হামবার্টের গুহা থেকে কেউ কোনদিন ফেরৎ গেছে বলে কি জানো তোমরা জাংচি?

জাংচি মাথা চুলকায়।

এমন সময় কলিংবেল জাতীয় একটা বেল বেজে উঠে।

হামবার্ট এবং তার অনুচরদ্বয় তাকায় ছাদের দিকে।

ছাদ থেকে একটা লিফট নেমে আসে নিচে।

লিফট থেকে নেমে দাঁড়ায় একটি লোক। আশ্চর্য লোকটা অবিকল হামবার্টের মত দেখতে।

লোকটা নেমে এসে দাঁড়ালো হামবার্টের সম্মুখে।

হামবার্ট ওর সঙ্গে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করলো তারপর বললো সংবাদ কি কিওকা?

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিয়ে বললো সংবাদ ভাল নয় মালিক।

ভাল নয় মানে? তুমি তাহলে দস্যু বনহুরের সন্ধান পাওনি? হামবার্ট রুক্ষ কণ্ঠে কথাগুলো বললো।

কিওকার মুখখানা গুমটো হয়ে উঠেছে, বললো সে—আমি আমার সহচরদের দ্বারা অনেক খোঁজ করিয়েছি কেউ দস্যু বনহুরের খোঁজ দিতে পারেনি।

সেই কারণে তুমি ফিরে এসেছো?

হাঁ মালিক শুধু শুধু.....

নাঃ তোমাকে দিয়ে কিছু হবেনা। হামবার্ট ক্রুদ্ধভাবে পায়চারী করলো কিছুক্ষণ! তারপর বললো—বুঝেছি, মৃত্যু ভয়ে তুমি পালিয়ে এসেছো কিওকা। কিন্তু মনে রেখো। দস্যু বনহুরের হাত থেকে রক্ষা পেলেও তুমি আমার হাত থেকে রেহাই পাবেনা।

কিওকা বললো—আপনি যে ভাবে কাজে আদেশ করেছেন, আমি সে ভাবেই কাজ করেছি। মৃত্যুর জন্য ভয় পেলে ও পথে পা বাড়াতাম না।

কিওকা তোমার জীবনের বিনিময়ে তোমার গোটা পরিবারকে আমি আজও জীবিত রেখেছি, না হলে কবে তোমার বংশ লোপ পেতো তুমিও রক্ষা পেতেনা কিওকা।

আমি জানি, আর জানি বলেই নিজের মৃত্যু পথ বেছে নিয়েছি।

হাঁ, মনে রেখো তুমি তোমার জীবনের বিনিময়ে ফিরে পেয়েছো তোমার গোটা পরিবারের জীবন। যেদিন আমার বিশ্বস্ত অনুচর ফাংফা আমাকে মনে করে তোমাকে সম্মান দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো তখন আমি উপস্থিত হয়ে নিজেই বিস্মিত হয়ে ছিলাম। ফাংফা আমাকে দেখে শুধু অবাকই হয়নি সেদিন একেবারে বোবা বনে গিয়েছিলো। ঐ দিনই আমি তোমাকে হত্যা করতে পারতাম কারণ তুমি জানো চীন দস্যু হামবার্ট কতবড় ভয়ঙ্কর। কিন্তু হঠাৎ সেদিন আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গিয়েছিলো। হাঁ তোমাকে আমি নিজে হত্যা না করে স্বয়ং দস্যু বনহুরকে দিয়ে তোমার হত্যা ঘটালে সে কোনদিন আর হামবার্টের সন্ধান করবেনা.....

সব আমি জানি মালিক।

এবং চিরদিন আমি আমার কাজ চালিয়ে যাবো এই চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে বসে। এ পৃথিবীর কাউকে আমি ভয় করি না শুধু ভয় করি দস্যু বনহুরকে। দস্যু বনহুর আমার যা ক্ষতি করেছে তা কোন দিনই পূরণ হবার নয়। কান্দাই পর্বতের তলদেশে আমার যে ঘাটি ছিলো তা সবগুলো ঘাটির

চেয়ে প্রধান। কান্দাই ঘাটি ধ্বংস হওয়ায় আমি একেবারে মুষড়ে না পড়লেও অনেকটা দমে গেছি। যদিও আমার চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের ঘাটি এখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত এবং চক্ষু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র বা ঘাটি তবু.....যাক্ যতদিন আমি দস্যু বনহুরকে শায়েস্তা করতে সক্ষম না হয়েছি ততদিন আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। হাঁ তোমার মৃত্যুর মধ্যে আমি আত্মগোপন করতে চাই বুঝলে?

বুঝেছি মালিক।

তবে কান্দাই থেকে ফিরে এলে কেনো?

গোটা কান্দাই শহর তন্ন তন্ন করে ঘুরেছি.....

তোমার সাহস হলো দস্যু বনহুরের সন্ধান করার?

না করে উপায় কি মালিক। জানি, আজ হলেও মরতে হবে কাল হলেও মরতে হবে।

তবে পুনরায় ফিরে যাও এবং কান্দাই পর্বতের নিচে যে কোন স্থানে একটি গুহা তৈরি করে সেখানে ঘাটি করে নাও। প্রতিদিন একটি করে অন্ততঃ লোক পাকড়াও করে এনে হত্যা করবে, মনে রেখো যেন লোকটাকে তুমি হত্যা করবে তার চোখ দুটো সম্পূর্ণ তুলে নেবে তারপর লাশটাকে ফেলে দিয়ে আসবে শহরের যে কোন স্থানে। এ সব কাজ অবশ্য তোমাকে নিজের হাতে করতে হবে না। এ সব কাজ করবে আমার লোকজন যারা তোমার মানে হামবার্টের সহচর হিসাবে সেখানে থাকবে। পর পর কয়েকটা হত্যালীলা সংঘটিত হলেই দস্যু বনহুর আপনা আপনি হাজির হবে। তুমি শুধু প্রতিক্ষা করবে কবে কোন মুহূর্তে এসে সে তোমার জীবন ছিনিয়ে নেবে তার জন্য। মূর্খ তুমি নিজে খুঁজে ফিরছো দস্যু বনহুরকে?

না খুঁজলে তাকে পাবনা বলেই খুঁজেছিলাম।

খুঁজতে হবে না, সে নিজেই খুঁজে নেবে তোমাকে। একটা কথা মনে রেখো কোনক্রমে মৃত্যুকালে যেন বলোনা যে তুমি আসল হামবার্ট নও। যদি দস্যু বনহুর জানতে পারে, তুমি হামবার্ট নও হামবার্ট আর একজন, তবে তোমার জীবন দিয়েও কোন ফল হবেনা, কারণ আমি তোমার বংশধরগণকে নির্মূল করবো।

হাঁ এ সব কথা পূর্বে তুমি বলেছিলো আমার স্মরণ আছে।

হামবার্ট এবার ফিরে তাকালো জাংচি এবং জিলুংয়াং এর দিকে—জাংচি জিলুংয়াং।

একসঙ্গে জবাব দেয় ওরা দু'জন—বলুন মালিক?

সব শুনলে তো?

শুনলাম মালিক। জবাব দিলো দু'জন একসঙ্গে।

এর মত নিরেট মূর্খ আর দ্বিতীয় জন নাই। বেটা নিজেই খুঁজে বেরিয়েছে দস্যু বনহুরকে। দস্যু বনহুর যেন মুড়ির মোঁয়া যে বাজারে পাওয়া যাবে।

জাংচি মাথা চুলকে বলে—দস্যু বনহুর তা হলে কেমন দেখতে মালিক? মুড়ির মোয়ার মত নয়?

জাংচি তুমি দেখছি এর চেয়েও বোকা। দস্যু বনহুর আমার মত মানুষ।

মালিক আপনার মত ভয়ঙ্কর দেখতে?

আমি দেখতে ভয়ঙ্কর নাকি? গর্জে উঠলো হামবার্ট।

মালিক আপনি খুব সুন্দর.....

তবে বললি?

আমার মনে ছিলোনা।

খবরদার আমার সম্বন্ধে কোন সময় খারাপ কথা মুখে আনবিনা। যাক হুংমা কোথায়?

হুংমা!

হাঁ।

হুংমা বন্দীখানায়।

ওকে একবার আমার বিশ্রাম কক্ষে পাঠিয়ে দে।

জাংচি মাথা চুলকে বললো—কিন্তু হুংমা যে এখন ঘুমাচ্ছে। ও বড্ড ঘুম কাতুরে যদি ঘুম ভাঙগে তবে সে রেগে-মেগে আগুন হবে।

আচ্ছা ঘুম ভাংলে পাঠিয়ে দিস।

আচ্ছা দেবো।

জিলুংয়াং!

বলুন মালিক।

তুমি কিওকার সঙ্গে কয়েকজন অনুচর দিয়ে দাও। দ্বিতীয় হামবার্ট সেজে সে কান্দাই চলে যাক। যতক্ষণ দস্যু বনহুর তাকে হত্যা না করেছে ততক্ষণ আমি কান্দাই এর পথে পা বাড়াতে পারছিনা।

জাংচি বলে উঠে—মালিক দস্যু বনহুরকে এতো ভয় পান কেনো? তার চেয়ে আপনি তো অনেক শক্তিমান।

ভয় আমি পাইনা তবে দস্যু বনহুর বড় সাংঘাতিক তাই..... আচ্ছা যাও তোমরা। কিওকা তুমি আমার কথা মত কাজ করবে।

কিওকা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করে হামবার্টের তারপর বেরিয়ে যায়।

❑

বৎস আমি জানতাম তুমি পারবে এবং সে কারণেই আমি এতোদিন ধরে প্রতিক্ষা করে এসেছি তোমার জন্য। বড় দুঃখ আমি তোমার চোখে চোখ রেখে বলতে পারি না। সব সময় তোমার দিকে পিছন ফিরে কথা বলতে হয়। তোমাকে প্রাণ ভরে দেখার সাহসও আমি পাইনা যদি কোন অঘটন ঘটে সে জন্য আমি দায়ী হবো। কথাগুলো বলে থামলো যাদুকর হুয়াংচু।

বনহুর হেসে বললো— হুয়াংচু তুমি যতখানি ভয় পাচ্ছো ঠিক ততখানি আমি নরম নই। তোমার সূর্য সাধনা দৃষ্টির চেয়ে আমার সাধারণ দৃষ্টি শক্তির তেজ কম নয়। সংজ্ঞা আমি হারাবো না হুয়াংচু।

জানি বনহুর তোমার দৃষ্টি শক্তির তেজ কম নয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি শক্তি বিষাক্ত। তোমার দৃষ্টি শক্তির যে তেজ তা বিষাক্ত নয়, কাজেই তোমার এবং আমার দৃষ্টি শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য। যাক, শোন বনহুর, তুমি যে সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কার করেছো এটাই যথেষ্ট। যে কোন মুহূর্তে তুমি হামবার্টের চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের ঘাটিগুলো ধ্বংস করে ফেলতে পারো।

পারি, এবং তার জন্য তুমিই হবে ধন্যবাদের পাত্র হুয়াংচু।

বনহুর, ধন্যবাদ আমি চাইনা। আমি চাই প্রতিশোধ, হামবার্ট শুধু জিহাংহায় নয় সমস্ত পৃথিবীময় সে নানাভাবে হত্যালীলা সংঘটিত করে

চলেছে। চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত আর চক্ষু সে জমা করে রেখেছে। আরও সে কত লোককে হত্যা করবে তার শেষ নাই।

হুয়াংচু আমি তাকে আর হত্যার সুযোগ দেবো না। শুধু তাকে নয়, যারা তাকে এতোদিন তার কাজে সহায়তা করে এসেছে তাদেরকেও নির্মূল করবো।

কিন্তু, কবে তুমি করবে বনহুর? আমার ভয় হয় কোন মুহূর্তে মাদামচীং তোমাকে.....

অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বনহুর, হাসি থামিয়ে বলে—হুয়াংচু আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তার অন্ত নাই দেখছি।

তাইতো তোমাকে হিমাগারে আটকে রেখেছি।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন আমাকে মনি মুক্তার মত সিন্দুকে তুলে রাখবে হুয়াংচু?

যতদিন তুমি এ দেশে থাকবে।

তবে কাজ হবে কি করে?

আমি যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকবো ততক্ষণ তুমি বাইরে থাকতে পারবে। মাদামচীং-এর সাধ্য নাই সে আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়।

বেশ তুমি তাহলে আমার রক্ষক হয়ে আমার সঙ্গে থাকবে।

তাই থাকবো, তবু তোমাকে একা বাইরে যেতে দেবো না। কথাগুলো বলে বেরিয়ে যায় হুয়াংচু।

বনহুর হীমাগারে তার শয্যায় শুয়ে পড়ে।

সম্মুখে রেকাবীতে নানা রকম ফল সাজানো। বনহুর ফল তুলে নিয়ে ভক্ষণ করে চলে। মনে পড়ে তার আস্তানার কথা।

বনহুর এখানে যখন ভাবছে তখন আস্তানায় নূরী ঘুমন্ত পুত্রের পাশ থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসে আস্তানার বাইরে।

অশ্বশালা থেকে বেছে নিয়ে আসে একটি অশ্ব, তারপর উঠে বসে সে অশ্ব পৃষ্ঠে।

অন্ধকার হলে কি হবে নূরী, ঠিক পথ চিনে নিয়ে অশ্ব চালনা করতে থাকে। জঙ্গল পেরিয়ে আসে প্রান্তরে উল্কা বেগে ছুটতে থাকে অশ্বটি।

এক সময় বড় রাস্তায়।

অন্ধকারে রাস্তা স্পষ্ট দেখা না গেলে ও সে বেশ চিনে নেয় এই পথে সে বনহুরের সঙ্গে শহরে এসেছে বহুবার। এক সময় নূরী চৌধুরী বাড়ির পিছনে এসে নেমে দাঁড়ায়। তারপর বাগান পেরিয়ে প্রবেশ করে গাড়ি বারান্দায়।

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে উপরে।

দারওয়ান তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলো।

নূরীর সমস্ত শরীরে কালো পোশাক। পুরুষের মত মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা।

নূরী উপরে এসে দেখতে পায় জানালা খোলা। অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করে সে ভিতরে। আলগোছে এসে দাঁড়ায় নূরী নূরের বিছানার পাশে।

অঘোরে ঘুমাচ্ছে নূর।

ওপাশের খাটে ঘুমিয়ে আছেন মরিয়ম বেগম। তার মৃদু মৃদু নাসিকা ধ্বনি হচ্ছে।

নূরী এসে দাঁড়ালো, পাশের টেবিলের ডিম লাইট স্বল্প আলো বিকিরণ করছিলো। নূরী পকেট থেকে একটি মোমবাতি বের করে জ্বালালো তারপর এগিয়ে ধরলো।

মোমের আলোতে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে রইলো সে নূরের মুখের দিকে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ছোট বেলার মুখখানা।

হঠাৎ এক ফোটা গড়িয়ে পড়ে নূরের চিবুকের উপর। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত কণ্ঠে শব্দ করে উঠে—আম্মি...আম্মি...চোখ মেলতেই কালো পোশাক পরা একটি ছায়া মূর্তি দেখতে পায়।

নূরী একটি মুহূর্ত বিলম্ব করে না সে মোম ফেলে দ্রুত বেরিয়ে যায় জানালা দিয়ে বাইরে। তারপর সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

ততক্ষণে মনিরার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, ছুটে আসে সে পাশের ঘর থেকে।

এদিকে মরিয়ম বেগমের ঘুম ভেঙ্গে যায়, তিনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে আসেন—কি হলো—কি হলো—নূর, কি হলো।

মনিরা পাশে বসে নূরের মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—কি হয়েছে নূর? দুঃস্বপ্ন দেখেছো বুঝি?

নূর তখন নিজের চিবুকে হাত বুলিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলছে—দুঃস্বপ্ন নয় আম্মি, দুঃস্বপ্ন নয়, সে এক জমকালো মূর্তি...ঐ ঐ জানালা দিয়ে পালিয়ে গেছে.....

মনিরার মুখ মন্ডল মুহূর্তে উজ্জল দীপ্ত হয়ে উঠে, মনিরা মনে করে ঠিক তার স্বামী এসেছিলো হঠাৎ নূর জেগে উঠায় পালিয়ে গেছে, আবার সে আসবে। একটা অপূর্ব আনন্দ উচ্ছাস বয়ে যায় তার হৃদয়ে। বলে মনিরা—ও কিছু নয় বাবা তুমি ঘুমাও।

মরিয়ম বেগমও বুঝতে পারেন, এ মনিরের কাজ, তাই তিনিও বেশি উত্তেজিত হন না! নানাভাবে নাতীকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

নূর বলে উঠে—আম্মি তুমি আমাকে ঘুমাতে বলেছো? আমি নিজের চোখে দেখেছি, জমকালো মূর্তি হাতে তার মোমের আলো। ঐ দেখো মোমটা পড়ে আছে...নূর আংগুল দিয়ে মেঝে এক পাশে পড়ে থাকা একটি মোমবাতী দেখিয়ে দেয়।

এক সঙ্গে মোমটির দিকে তাকায় মনিরা এবং মরিয়ম বেগম। মোমবাতীটা যদিও নিভে গিয়েছিলো তবু মোমের সলতে থেকে মৃদু মৃদু ধূয়ো বের হচ্ছিলো তখনও।

মনিরা উঁবু হয়ে মোমবাতীটা হাতে তুলে নেয়।

নূর বলে উঠে—আম্মি এই দেখো মোমের ফোটা আমার চিবুকে পড়েছে এখনও জ্বালা করছে এখানে।

মনিরা পুত্রের চিবুকে হাত বুলিয়ে দেয়।

মরিয়ম বেগম কি বলবেন যেন ভেবে পান না। তিনি মনে মনে ভেবে চলেছেন মনির এসেছিলো হয়তো মোমের আলোতে সে সন্তানের মুখখানা ভাল করে দেখছিলো হঠাৎ এক ফোটা মোম পড়ে গিয়েছিলো ওর চিবুকে।

মনিরাকে লক্ষ্য করে বলে নূর—আম্মি তোমরা যাই বলো আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি কোন বদমাইস চোর হবে।

চোর! না না, চোর নয় বাবা। আর যদি সে চোর হবে তবে সে মোম জ্বেলে তোমার মুখে কি খুঁজছিলো।

জানি না, তবে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সে এসেছিলো আম্মি।

মরিয়ম বেগম বলেন—তুই কি ভয় পেয়েছিস দাদু?

হেসে বলে নূর, ভয় পাবো আমি কি যে বলো। তবে হঠাৎ আমার ঘুম ভেংগে যাওয়ায় কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, না হলে আমি তাকে ধরেই ফেলতাম।

নূরের ছোট্ট কচি মুখে বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে খুশি হল মরিয়ম বেগম।

মনিরা অনেক বুঝিয়ে-বাঝিয়ে পুত্রকে পুনরায় শয্যায় শুইয়ে ফিরে এলো নিজের কক্ষে। উন্মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকালো অন্ধকারময় শহরটার দিকে। চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছা হলো, ওগো তুমি কোথায়। আমি যে তোমার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতিক্ষা করছি। যদি তুমি এসেই ছিলে তবে ফিরে গেলে কেনো। মনিরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তারপর ফিরে আসে বিছানায়। কিন্তু চোখে আর ঘুম আসনে না, জানি কোন মুহূর্তে আসবে সে। একটা হাতের স্পর্শের জন্য, একটা শান্ত কণ্ঠের প্রতিধ্বনির জন্য, মনিরা অপেক্ষা করতে থাকে।

এক সময় রাত ভোর হয়ে আসে।

মনিরার চোখের পাতা দুটো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ে মনিরা।

❑

নূরী পুত্রের চুলে হাত বুলিয়ে আদর করছিলো। নিস্পলক নয়নে দেখছিলো সে পুত্রের মুখ।

ঘুম ভেংগে যায় জাভেদের।

চোখ মেলে বলে জাভেদ—আম্মি এতো ভোরে তোমার ঘুম ভেংগে গেছে?

হাঁ বাবা।

হঠাৎ জাভেদের দৃষ্টি মায়ের শরীরের দিকে চলে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে অবাক কণ্ঠে বলে—আম্মি তুমি এ পোশাক পরেছো কেনো? বুঝেছি তুমি নিজে বাপুর মত দস্যুতা করতে গিয়েছিলে?

নারে, না।

তবে এ পোশাক কেনো পরেছো?

শহরে গিয়েছিলাম।

শহরে! কেনো গিয়েছিলে শহরে আম্মু?

জাভেদ মাঝে মাঝে নূরীকে আম্মু বলে ডাকতো। এ ডাক অবশ্য বনহুর জাভেদকে শিখিয়েছিলো। ওকে কোলে নিয়ে বলতো বনহুর—তোমার আম্মু কই জাভেদ? বলো তোমার আম্মু কই?

জাভেদ আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতো—ঐ তো আম্মু।

জাভেদ আম্মু বলতে ভালবাসে তাই সে বেশির ভাগ সময় আম্মু বলে। নূরীও বেশি খুশি হয় যেন ঐ ডাক শুনলে।

নূরী জাভেদের চিবুকে নাড়া দিয়ে বললো—শহরেও আমার তোর মত একটা ছেলে আছে তাকেই দেখতে গিয়েছিলাম।

আশ্চর্য হয়ে বলে জাভেদ—আম্মু শহরেও তোমার আর একটা ছেলে আছে?

হাঁ, বাপ।

সত্য আম্মু?

বললাম তো সত্য।

তবে এতোদিন বলোনি কেনো আম্মু?

বলে কি হবে, সে তো কোনদিন আমার কাছে আসবে না, তাই বলিনা।

আম্মু, তুমি বুঝি ওকে আমার মত ভালবাসো?

হাঁ তোমাকে যেমন ভালবাসি তেমনি ভালবাসি তাকে।

তাই বুঝি দেখতে যাও?

হাঁ, বাবা তাই ওকে না দেখে থাকতে পারি না।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবে আম্মু?

বড় হলে যেও। আচ্ছা এবার উঠে পড়ো জাভেদ। তোমার শিক্ষক অপেক্ষা করছে।

আম্মু, তুমি যে বইগুলো দিয়েছিলে সবগুলো পড়া শেষ হয়ে গেছে।

সত্যি?

হাঁ, আম্মু।

বেশ, আজ আমি তোমার শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করবো।

জাভেদ উঠে পড়ে।

সকাল বেলা মুখ হাত ধুয়ে সে প্রথম লেখাপড়া করতে বসে। তারপর নাস্তার পালা। নাস্তা শেষ হলে দ্বিতীয় শিক্ষক জাভেদকে নিয়ে অস্ত্র শিক্ষা দেয়। মল্ল যুদ্ধ শিক্ষা দেয় তৃতীয় শিক্ষক। চতুর্থ শিক্ষক সাঁতার শিক্ষা দেয়। পঞ্চম শিক্ষক জাভেদকে নিয়ে তীর ধনু চালনা শেখায়।

নূরী নিজে এসব শিক্ষায় সময় উপস্থিত থাকে এবং কোথায় ভুল হচ্ছে না হচ্ছে দেখিয়ে দেয়। নূরীর স্বপ্ন জাভেদ তার বাবার চেয়ে কোন অংশে কম হবেনা। নূরী নিজেও মাঝে মাঝে জাভেদকে অস্ত্র শিক্ষা দেয়, ঘোড়ায় চড়া শেখায় সে নিজে পুত্রকে।

যদিও জাভেদ এখনও শিশু তবু সে মায়ের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে অশ্ব বলগা ধরতে শিখেছে।

আজ নূরী জাভেদের পড়ার সময় এসে বসে এবং শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করে—ওর পড়া শোনা কেমন হলো?

শিক্ষক বললো—আমি আজই তোমার সঙ্গে দেখা করবো মনস্থ করে ছিলাম। তুমি নিজেই এসেছো ভালই হলো।

বলুন কি বলতে চান?

জাভেদের পড়া শোনা অত্যন্ত ভাল। বাড়িতে যতটুকু পড়ানো দরকার তা শেষ হয়ে গেছে।

সত্যি বললেন?

হাঁ নূরী, তোমার ছেলে তার বাপের মতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান! আমি জাভেদকে পড়াতে পড়াতে চলে যাই সেই অতীতের দিনগুলিতে। এমনি করেই আমি শিক্ষা দিতাম বনহুরকে। বনহুর যেমন পড়া শোনায় মনোযোগী ছিলো ঠিক জাভেদ তেমনি, ভুলে যাই এ বনহুর নয় তারই ছেলে.....

বৃদ্ধা শিক্ষকের কথা শুনে হাসে নূরী।

এ শিক্ষক তাদেরই আস্তানার একজন শিক্ষিত দস্যু। নাম এর আলী মাসুদ। কালু খার বিশেষ বন্ধু এবং সহচর ছিলো সে। বনহুরকে ছোট বেলায় লেখাপড়া শিক্ষার দায়িত্ব ছিলো আলী মাসুদের উপর। যুদ্ধ শিক্ষা

এবং অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিয়েছিলো কালু খাঁ নিজে বনহুরকে। বনহুর ও নূরী তাই এখনও আলী মাসুদকে অত্যন্ত সম্মান করে।

আলী মাসুদের কথায় খুশি না হয়ে পারে না নূরী। নিজের কণ্ঠ থেকে মুক্তা মালা খুলে শিক্ষককে দেয়—নিন, আমার সন্তানকে আপনি যেভাবে প্রথম শিক্ষা দান করলেন তাতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। নিন, এ মালা আপনি নিন আলী মাসুদ চাচা।

নূরীর কথায় চোখ দুটো আলী মাসুদের ছলছল করে উঠলো। সে বললো—নূরীক তুমি আমার কন্যার মত, বনহুর আমার সন্তান। জাভেদ আমার নাতী.....একটু থেমে বললো আবার—বুড়ো হয়েছি, এখন দস্যুতা করতে পারি না, এ টুকু যদি না পারি তবে কি করবো বলতো মা নূরী? জাভেদ পড়া শোনা করে বড় হচ্ছে আমার কত আনন্দ কিন্তু তেমনি মুষড়েও পড়ছি। জাভেদের পড়া আমার কাছে শেষ হলে আমি তখন কি করবো। জানিস মা নূরী, কালু খাঁ যেদিন বনহুরকে এনে আমার সম্মুখে দাঁড় করালো, দাঁড় করিয়ে বললো— মাসুদ আজ থেকে বনহুরকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব রইলো তোমার উপর। আমি নিজে কিছুটা শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু যথেষ্ট নয়। এখন থেকে তুমি ওকে পড়াশোনা করাবে। আমি বনহুরকে শুধু দস্যুই করবো না সে হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু, শিক্ষা দীক্ষা শক্তি বুদ্ধি কৌশলে সে হবে পৃথিবীর বিস্ময়.....মা নূরী, আমি যে দিন বনহুরকে বুকে টেনে নিয়ে শপথ করেছিলাম কালু খাঁর বাসনা আমি পূর্ণ করবো। বনহুর আজ সমস্ত বিশ্বের বিস্ময়—কালু খাঁ তাকে এমন কোন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেনি যা সে পারে না।

নূরী অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলো আলী মাসুদের কথাগুলো। অনেকদিন সে এমন করে এই বৃদ্ধের-কথা শোনেনি। অবশ্য আলী মাসুদ বনহুরের কান্দাই আস্তানায় ছিলোনা। সে বৃদ্ধ হবার পর অবসর মুহূর্তে বনহুরের বিভিন্ন আস্তানায় দেখা শোনা করতো। জাভেদ বড় হবার পর বনহুর নিজে আলী মাসুদকে এনেছে কান্দাই আস্তানায় এবং সে নিজে জাভেদের পড়া শোনা শিক্ষা দেবার ভার ওর উপর সঁপে দিয়েছে। নূরী স্বামীর সম্বন্ধে কথা গুলো অবাক হয়ে শুনেছিলো।

বলে চলেছে আলী মাসুদ—সব শিক্ষা লার্ভ করেও বনহুরের স্পৃহা মিটলোনা সে বিমান চালনা শিখবে। কালু খাঁ পুত্রের আকাঙ্খা পূর্ণ করার জন্য তাকে পাইলটে ভর্ত্তি করে দিলো। আরও মনে আছে বনহুর পাইলটের ইন্টারভিউ এ প্রথম স্থান অধিকার করেছিলো। দক্ষ পাইলট হয়েছিলো বনহুর। মা নূরী সব শিক্ষাই সে গ্রহণ করেছে কিন্তু একটা শিক্ষা সে আজও পায়নি সে হলো অসৎ কর্ম.....কথাটা বলে হেসে উঠলো বৃদ্ধ মাসুদ, তার চোখে মুখে অপূর্ব একটা দীপ্ত ভাব ফুটে উঠলো।

বৃদ্ধের মুখোভাব লক্ষ্য করে নূরীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো আনন্দে।

বৃদ্ধা তবু বলে চলেছে—জীবনে বহু মানুষ দেখেছি কিন্তু এমন মানুষ দেখিনি যে বহু মূল্য মানিক হাতে পেয়েও সাগরের জলে নিক্ষেপ করে। বনহুর তাও করেছে! হাঁ আমি দোয়া করি তোমার জাভেদ যেন তার বাপের মত হয়।

নূরী নিজে কদমবুসী করলো এবং জাভেদকে করালো। তারপর বললো—আলী মাসুদ চাচা আপনার দোয়া যেন সফল হয়।

আলী মাসুদ হেসে বললো—নিশ্চয়ই হবে।

❑

নূর!

বলো আম্মি?

সেদিন তুই কি সত্যি জমকালো পোশাক পরা কাউকে দেখেছিলি?

হাঁ আম্মি সত্যিই আমি দেখেছিলাম। সমস্ত শরীরে জমকালো পোশাক, মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা।

পুত্রের কথা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে যায় মনিরা, অস্ফুট কণ্ঠে বলে—সত্যিই কি তবে সে এসেছিলো?

নূর মায়ের মুখোভাব লক্ষ্য করে বলে উঠে—সে কে আম্মি? তুমি কার কথা বলছো?

নূর কথাটা ধরে ফেলেছে, তাড়াতাড়ি বলে উঠে মনিরা—না না ও কিছু নয়। তুই পড় নূর তুই পড়.....

চলে যায় মনিরা।

নূর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মায়ের চলে যাওয়া পথের দিকে তারপর একটু হেসে পুনরায় পড়ায় মনোযোগ দেয়।

মনিরা ঐ দিনের পর থেকে সব সময় স্বামীর জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষা করছিলো কিন্তু কই সে এলো।

কিন্তু যার জন্য মনিরা ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতিক্ষা করছিলো সে তখন সুদূর জিহাংহায় যাদুকর হুয়াংচুর হীমাগারে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের।

তার কানে ভেসে আসে সেই শব্দ। মেঝের নিচে কোথাও শব্দটা হচ্ছে। আজ যেন শব্দটা আরও স্পষ্ট বলে মনে হলো তার কাছে।

তবে কি মাদামচীং এবার তাকে হরণ করার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করবে। একটা নারীর জন্য তার এতো ভয় এবং সে কারণেই তাকে হুয়াংচু এই হীমাগারে আটক করে রেখেছে। বনহুর শয্যায় উঠে বসে, তাকায় সম্মুখের দিকে। ঐ জায়গা থেকেই শব্দটা আসছে।

বেশ স্পষ্ট শব্দটা, যেন মেঝেটার নিচে কোন যন্ত্র বা মেশিন চলছে। আর একটু তা হলেই মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে মাদামচীং নয় তার সহচরগণ।

হুয়াংচু বলেছে মাদামচীং-এর চোখে বিষ, দেহতে বিষ। তবে কি এই নারীকে সায়েস্তা করার কোন উপায় নাই। হুয়াংচু আরও বলেছে মাদামচীং-এর যাদু গুহায় যে সব মৃত দেহ রয়েছে সব তার খেয়ালের শিকার।

বনহুর হেসে উঠে—মাদামচীং তাকে নিজেও তার খেয়াল মত খেলা করতে চায়। তাকে ওর পছন্দ হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু.....

হঠাৎ শব্দটা বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো আজও মাদামচীং ব্যর্থ হলো তার কাজে। হুয়াংচুর হীমাগার সত্যি আশ্চর্য এক রক্ষা কক্ষ। যেমন পিতা তেমনি তার কন্যা। কিন্তু পিতার উদ্দেশ্য মহৎ আর কন্যার উদ্দেশ্য মন্দ।

মাদামচীংকে এভাবে নর হত্যা করতে দেবেনা সে। বনহুর শপথ গ্রহণ করে হামবার্ট ও তার চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের গুপ্ত ঘাটিগুলো ধ্বংস করতে হবে তারপর মাদামচীংকে.....

হুয়াংচু একটি পথ বনহুরকে দেখিয়ে দিয়েছিলো ঐ পথে সে ভূগর্ভ দিয়ে বহুদূর যেতে পারতো। বনহুর উঠে পড়লো বেশিদিন জিহাংহায় থাকা তার চলবেনা কারণ কান্দাই আস্তানায় ফিরে যাওয়া তার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রহমান ওয়্যারলেসে জানিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশে এক ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়েছে। একেই সেখানে মানুষ পাকিস্তানী হানাদারদের অত্যাচারে মৃত্যু প্রায় তারপর শুরু হয়েছে মুনফাকারী আর কালোবাজারীদের নিষ্পেষণে। দ্রব্য-মূল্য চরম সীমায় পৌঁছেছে যার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ ফেঁপে উঠছে আংগুল ফুলে কলা গাছের মত, আর এক শ্রেণীর মানুষ অনাহারে ধুকে ধুকে মরছে। এদের বাঁচাতে হবে, যেতে হবে তাকে আবার বাংলাদেশে। কিন্তু তার পূর্বে জিহাংহায় রয়েছে অনেকগুলো কাজ। এ কাজগুলো শেষ না করে সে যেতে পারবেনা। পায়চারী করতে থাকে বনহুর, পাশের টেবিলে রাশি কৃত ফল মূল।

হুয়াংচু জানতো দস্যু বনহুরের প্রিয় খাদ্য হলো ফল মূল, তাই সে ওর জন্য নানারকম ফল সংগ্রহ করে দিতো। বনহুর এক থোকা আংগুর ফল হাতে তুলে নিয়ে মুখে দিতে যায় অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠে বাংলাদেশের শতশত অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের মুখ। বনহুর আংগুরের ঝোপটা রেখে দেয় রেকাবীতে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বর—বৎস তুমি যা ভাবছো তা সত্য। শতশত অসহায় মানুষের মুখে আজ অন্ন নাই। পরনে বস্ত্র নাই, তিল তিল করে তারা ধুকে ধুকে মরছে। জানি তাদের কথা স্মরণ করে তুমি দুঃখ পাচ্ছো দুঃখ করে কি করবে। বাংলাদেশ সরকার কি কম চেষ্টা করছে এইসব দুঃস্থ

মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য। কিন্তু পারছেনা, কারণ এর পিছনে রয়েছে বিদেশী চক্রান্তের হাত ছানি...

হুয়াংচু তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনা। যাদু বিদ্যা আমি কোনদিন বিশ্বাস করিনা বা করতাম না একথা তোমাকে আগেও বলেছি। তুমিও বলেছো আমার মনের কথা আমি শুনে আশ্চর্য হয়েছি। তুমি বলেছো প্রাকৃতিক কোন শক্তিদ্বারা আসল যাদু বিদ্যা পরিচালিত হয়। সেদিনও আমার মনে সন্দেহ ছিলো, যদিও তুমি তার বহু প্রমাণ আমাকে দেখিয়েছিলে। আজ আমি তোমার কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেছি। হুয়াংচু বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করিনি তবু আমি বাঙালি এই আমার গর্ব। আর সেই গর্বের অনুভূতিতেই বাংলার জন্য আমার মন কাঁদে। মন কাঁদে বাঙ্গালী ভাইবোনদের জন্য। ১৯৭১ এ আমি বাংলায় গিয়েছিলাম। বাংলার সংগ্রামী মানুষের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। সত্যি হুয়াংচু বাংলা জননীর যে আকর্ষণ আমি তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম আজও করেছি। তুমি ঠিকই বলেছো হুয়াংচু বিদেশী কোন চক্রান্তের বেড়াজালে আচ্ছন্ন আজ গোটা বাংলাদেশ। হুয়াংচু অচিরেই আমি বাংলাদেশ অভিমুখে রওয়ানা দেবো এবং আমার বিশ্বাস বাংলাদেশকে আমি বিদেশীর ষড়যন্ত্রমূলক বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবো। বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা সার্থক হোক এটাই আমি চাই।

হুয়াংচু এতোক্ষন স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে বনহুরের কথাগুলো শুনছিলো। এবারে সে বলে উঠলো—বনহুর তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। বাংলাদেশ যে অবস্থায় আজ দাঁড়িয়েছে তাতে বাঙ্গালী জাতির জীবন আজ ওষ্ঠাগত তুমি যাও বাংলা জননীকে রাহু মুক্ত করো।

আশীর্বাদ করো হুয়াংচু।

আশীর্বাদ তোমার জন্য নয় বনহুর আশীর্বাদের অনেক উর্দ্ধে তুমি।

হুয়াংচু।

হাঁ-বনহুর।

❑

হামবার্ট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠলো—ম্যানেজার দিন দিন আমাদের কোম্পানীর কাজ যেন শিথীল হয়ে পড়ছে। হিন্দল থেকে কোম্পানীর ম্যানেজার জানিয়েছে, এ মাসে সেখানে পাঁচশত চক্ষু সংগ্রহ হয়নি। ব্লাড ব্যাঙ্কের দশটা বাক্সও তারা পার্শ্বেল করে পাঠাতে সক্ষম হয়নি। পিরোজপুর থেকেও ঐ রকম সংবাদ। রাকসুয়া থেকেও আজ পর্যন্ত কোন সংবাদ পাচ্ছিনা।

ম্যানেজার মাথা চুলকে বললো—জঙ্গল বাড়ি ঘাটি দস্যু বনহুর ধ্বংস করে দেবার পর থেকে আমাদের কোম্পানীর কাজগুলো কেমন যেন.....

দস্যু বনহুর জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস করেছে তাতে কোম্পানীর কিছু ক্ষতি হয়েছে তাতে আমাদের বিভিন্ন স্থানের কাজে শিথীলতা কেনো?

মালিক হয়তো কোম্পানীতে যারা কাজ করতো তাদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি....

আতঙ্ক! দস্যু বনহুরের ভয়ে আতঙ্ক?

হাঁ মালিক। দেখলেন তো, আমাদের জঙ্গলবাড়ি ঘাটি কান্দাই পর্বতের তলদেশে যেখানে কোনদিন কোন মানুষ প্রবেশে সক্ষম হবে না বলে আমরা সবাই জানতাম, সেই জঙ্গলবাড়ি ঘাটি দস্যু বনহুর ধ্বংস করে ফেললো।

হুঙ্কার ছাড়ে হামবার্ট—মূর্খ জঙ্গলবাড়ি ঘাটি ধ্বংস কে করেছে দস্যু বনহুর না আমি?

মালিক শুনেছি আপনিই করেছেন কিন্তু...

বলো থামলে কেনো?

কিন্তু দস্যু বনহুরের জন্যই তো...

আবার দস্যু বনহুরের জন্য বলছো?

মালিক আপনি যাই বলুন দস্যু বনহুরের ভয়েই আমাদের কোম্পানীর লোকজন আর ঠিক মত কাজ চালিয়ে যেতে পারছে না।

দস্যু বনহুর, দস্যু বনহুর....দস্যু বনহুর কি এক সঙ্গে আমার সবগুলো ঘাটিতে গিয়ে হানা দেবে? হিন্দল, ফিরোজপুর, রাকসুয়া, জিহাংহা সব জায়গায় কি দস্যু বনহুর...

কতকটি তাই মালিক। দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। সে এক সঙ্গে সব জায়গায় হানা দিতে পারে।

সত্যি বলছো ম্যানেজার?

সত্যি আমরা সেই রকম শুনেছি।

তবে সে আমার চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে কোনদিন হানা দিতে পারবে না।

মালিক বলেছি তো তার অসাধ্য কিছু নেই।

ম্যানেজার যতক্ষণ দস্যু বনহুরকে আমি হত্যা করতে সক্ষম না হয়েছি ততক্ষণ কোন কাজে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। কিওকা ঠিক আমার মত দেখতে...

হাঁ মালিক কিওকা ঠিক আপনার মত দেখতে এক পা খোঁড়া...

কি বললে আমার পা খোঁড়া?

না না ভুল হয়েছে এক পা খাটো।

হাঁ তাই বলবে ম্যানেজার।

আপনার মত কিওকার এক পা খাটো এক চোখ কানা...

কি বললে আমার চোখ কানা? আমি তো জন্মের থেকে চক্ষুহীন।

হাঁ ভুল হয়েছে, আপনার মতই এক চক্ষুহীন সেও। আপনার মুখে যেমন বসন্তের দাগ তেমনি ওর মুখেও। আপনি যেমন কদাকার দেখতে...

আবার ভুল করছো আমি কদাকার?

না না সুশ্রী। আপনার মতই কিওকা সুশ্রী।

হাঁ সে সব দিকে ঠিক আমার মত...

শুধু আপনার মত সুচতুর শয়তান নয়।

কি বললে?

বললাম আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান তাই...

শেষ দিকে আর একটা কথা তুমি উচ্চারণ করলে ভেবে দেখেছো এ জন্য তোমাকে আমি এই মুহূর্তে হত্যা করতে পারি?

পারেন। আলবৎ পারেন, কিন্তু করবেন না।

কেনো, কেনো করবো না?

কারণ এখন আপনি আমাদের সাহায্য ছাড়া বাঁচতে পারেন না। কারণ দস্যু বনহুরের আতঙ্কে আপনি চীন প্রাচীরের এই গুপ্ত স্থান ছাড়া বেরুতে পারছেন না।

ম্যানেজার তুমি সত্য কথা বলেছো, আমি এখন...যাক তুমি আমাকে শয়তান বললে তাও ক্ষমা করলাম। কিওকাকে হামবার্ট সাজিয়ে আমি কান্দাই পাঠিয়েছি।

অতি বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন মালিক।

হাঁ দস্যু বনহুর বুঝতেও পারবে না কিওকা আসল হামবার্ট নয় সে নকল।

কিওকাকে হত্যা করার পর আপনি কি করবেন?

বনহুর যখন্ হামবার্টের সন্ধান থেকে ক্ষান্ত হবে আমি তখন দস্যু বনহুর হত্যায় আত্মনিয়োগ করবো। জানো ম্যানেজার দস্যু বনহুরকে নিপাত করতে পারলে তবেই আমি পুনরায় নব উদ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র কাজ করতে সক্ষম হবো। যাদুকর হুয়াংচুর ক্ষমতা নাকি অসীম তাই আমি হুয়াংচুকে খোঁজ করছি। হয়তো পেয়েও যাবো...ম্যানেজার তুমি এক হাজার চক্ষুসহ দু'টো আই ব্যাঙ্ক বাক্স জবরু অভিমুখে পাঠানোর জন্য তৈরি করে নাও। আগামী সপ্তাহে আমাদের একটি জাহাজ জবরু অভিমুখে রওয়ানা দেবে ঐ জাহাজে আই ব্যাঙ্কের বাক্স দুটো তুলে দিবে।

আচ্ছা মালিক।

তবে এখন যাও।

ম্যানেজার চলে যায়।

এতোক্ষণ এক পাশে জড়ো সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো জিলুংয়াং আর জাংচি।

হামবার্ট বললো—তোমরা এতোক্ষণ কি করছিলে?

এক সঙ্গে বললো জাংচি আর জিলুংয়াং—আপনাদের কথাবার্তা শুনছিলাম।

তোমরা দু'জন বড় বদমাইস হয়েছো?

বদমাইস বটে তবে আপনার মত...

বলো থামলে কেনো আমার মত কি?

মানে—মানে ম্যানেজার শেষ কথাটা যা বলেছিলো, মানে যার জন্য আপনি তাকে...

হত্যা করতে চেয়েছিলাম সেই কথা?

হাঁ মালিক।

আমি তবে শয়তান।

না মালিক শয়তানের বাবা।

জাংচি মুখ সামলে কথা বলবে। এতোদিন কবে তোমরা যমের বাড়ি যেতে কিন্তু...

কিন্তু কেনো যাইনি মালিক?

কান্দাই জঙ্গলবাড়ি ঘাটি ধ্বংস হওয়ায় আমার অনেকগুলো অনুচর ধ্বংস হয়েছে...

এবার বুঝেছি।

কি বুঝেছো?

জঙ্গল বাড়ি ঘাটি ধ্বংস হওয়ায় আপনি অনেকখানি দমে গেছেন মালিক।

দমে নয় কেমন যেন...

বুঝেছি একটা ভয় ভয় ভাব এসেছে আপনার মধ্যে।

ভয়। খবরদার অমন কথা মুখে এনো না। ভয় করে না হামবার্ট কাউকে।

দস্যু বনহুরকেও না।

না, শোন জাংচি জিলুংয়াং তোমরা যাই বলো আমি দস্যু বনহুরকে হত্যা না করে ছাড়বো না। এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমি কান্দাই রওয়ানা দেবো।

কিন্তু কিওকা নিহত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে মালিক।

হাঁ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই জিলুংয়াং। জাংচি হুংমা কে নিয়ে এসো আমি আজ ওর কাছে জেনে নেবো রাজার সঙ্গে ওর কত দিনের পরিচয় ছিলো।

জাংচি ঢোক গিলে বলে—মালিক হুংমা...

যাও কোন কথা শুনতে চাইনা হুংমাকে নিয়ে এসো গে।

জাংচি চলে যায়।

জিলুংয়াংও তাকে অনুসরণ করে।

একটু পরে ফিরে আসে জাংচি এবং জিলুংয়াং।

হুংমাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

হামবার্ট বলে—হুংমা তুমি এখন কোথায় জানো?

হুংমা কোন কথা বলে না।

হামবার্ট কর্কশ কণ্ঠ যতদূর সম্ভব নরম করে নিয়ে বলে—হুংমা তুমি এখন আমার গুপ্ত ঘাটিতে বন্দী আছো।

হুংমা বলে উঠে—কি বলতে চাও তুমি?

তোমাকে এখানে এনেছিলাম কেনো তা জানো?

হাঁ জানি, রাজা কোথায় সেই খোঁজ জানার জন্য।

ঠিক বলেছো কিন্তু তুমি যা বলেছিলে সত্য হয়নি রাজাকে মাদামচীং পাকড়াও করে নিয়ে ফেলে। সে এখন মাদামচীং এর প্রাসাদে নাই।

হুংমা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো—তবে রাজা কোথায় আছে?

সে যেখানেই থাক আমি তার সন্ধান জানি এবং যে কোন মুহূর্তে তাকে আনতে পারবো।

সত্যি রাজাকে তুমি এনে দিতে পারবে?

হাঁ পারবো। তবে এক শর্তে.....

হুংমা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকায় হামবার্টের কুৎসিত মুখ খানার দিকে।

হামবার্টের দু'চোখে লালসা।

কয়েক পা সরে আসে হামবার্ট হুংমার দিকে। বলে হামবার্ট—হুংমা যতদিন আমি রাজাকে আনতে না পারবো ততদিন তুমি আমার হবে বলো রাজি আছো?

মুহূর্তে হুংমার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো যেন। কয়েক পা পিছিয়ে গেলো হুংমা দ্রুতগতিতে।

হামবার্ট হেসে উঠলো কুৎসিত বিকৃত সে হাসি, বললো হুংমা—পিছিয়ে যাচ্ছো কেনো? জানো এখানে কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না।

না না তুমি আমাকে আমার বাবার হোটেলে পাঠিয়ে দাও ঈশ্বরের শপথ তুমি আমাকে আমার বাবার হোটেলে পাঠিয়ে দাও।

হামবার্টের দু'চোখে তখন ক্ষুদ্ধ শার্দ্দুলের লালসা, সে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যায়।

জাংচি এবং জিলুংয়াং তখনও দাঁড়িয়েছিলো। হামবার্ট ওদের লক্ষ্য করে বললো—তোমরা চলে যাও জাংচি জিলুংয়াং।

ওরা হামবার্টকে কুর্নীশ জানিয়ে চলে গেলো।

হামবার্টের দিকে তাকিয়ে হুংমার দু'চোখ কপালে উঠেছে, রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

হামবার্ট এগুতে থাকে হুংমার দিকে।

হুংমা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে।

এমন সময় জিলুংয়াং প্রবেশ করে—মালিক।

থমকে পিছু ফিরে তাকায় হামবার্ট জিলুংয়াংকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে সে বলে—কি চাও?

জিলুংয়াং মাথা চুলকে বলে—মালিক বড় হুজুর ডাকছেন।

গর্জে উঠে হামবার্ট বড় হুজুর—কে বড় হুজুর? যাও, আমিই সব, বড় হুজুর কে তাকে চিনিনা।

মালিক।

হাঁ, যাও—তাকে বলে দিও আজ থেকে প্রাচীরের অভ্যন্তর ঘাটির সমস্ত দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করলাম। বড় হুজুরকে বন্দী করো.....

মালিক আপনি কি বলছেন?

যাও কোন কথা বলোনা জিলুংয়াং।

আচ্ছা মালিক যাচ্ছি।

জিলুংয়াং বড় হুজুর বলে আর কেউ থাকবে না। আমি একাই আমার কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিপতি মনে রেখো?

আচ্ছা মনে রাখবো। কথাটা বলে বেরিয়ে যায় জিলুংয়াং।

হামবার্ট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে তারপর আপন মনেই বলে—বড় হুজুর। কে বড় হুজুর ঐ জুজুবুড়োটা। ওকে তো আমি পার্টনার করে নিয়েছি। ও জানে সে আমার চেয়ে বড় কিন্তু নির্বোধের দল জানেনা হামবার্টের চেয়ে বড় কেউ হতে পারেনা। হুংমা তুমি আমার বুকে এসো—প্রাণ ভরে তোমাকে ভালবাসবো। রাজ রাণীর চেয়েও সুখে থাকবে.....

হুংমা আর্তকণ্ঠে বলে উঠে—না আমি রাজরানী হতে চাই না। তুমি আমাকে আমার বাবার হোটেলে রেখে এসো। আমাকে তুমি মুক্তি দাও.....

মুক্তি! হুংমা তোমার মত শত শত তরুণী আমার বন্দীশালায় আটক আছে। আমি তাদের ইচ্ছা মত ব্যবহার করি। তুমি যদি আমাকে ধরা না দাও তবে তাদের মত তোমার অবস্থাও হবে।

না না আমি তোমাকে চাই না।

তবে কি চাও?

আমাকে পৌঁছে দাও আমার বাবার হোটেলে।

ও আমাকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না? হোটেলের হাজার হাজার খদ্দেরকে খুশি করাই তোমার কাজ তাই না? কিন্তু মনে রেখো হুংমা চীন প্রাচীরের

অভ্যন্তর থেকে আর তোমার মুক্তি নাই। চিরদিনের জন্য তুমি আমার শিকার হয়ে থাকবে। কথাগুলো বলে হামবার্ট হুংমাকে ধরতে যায়।

হুংমা আর্তনাদ করে উঠে—বাঁচাও, বাঁচাও.....

হামবার্ট হুংমাকে ধরে ফেলেছে ততক্ষণে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হয় হামবার্টের দক্ষিণ হস্তের বাজুতে।

সঙ্গে সঙ্গে হামবার্ট মুক্ত করে দেয় হুংমাকে, যন্ত্রনায় মুখখানা তার বিকৃত হয়ে উঠে, বাম হস্তে ছোরাখানা টেনে তুলে নেয় বাজু থেকে। বিস্ময় ভরা চোখে দেখতে পায় ছোরাখানায় গাঁথা রয়েছে একটা ছোট্ট ভাঁজ করা কাগজের টুকরা। যদিও যন্ত্রণায় হামবার্ট মরিয়া হয়ে উঠেছে তবু সে ছোরা থেকে ভাঁজ করা কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে। অস্ফুট শব্দ করে উঠে সে যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে—দস্যু বনহুর।

হুংমা কিছু বঝুতে না পেরে আলুথালু বেশে তাকিয়ে থাকে হামবার্টের যন্ত্রণা কাতর মুখের দিকে। হামবার্টের মুখোভাব লক্ষ্য করে হুংমা বুঝতে পারে কাগজের টুকরাখানায় কি লিখা আছে যা শয়তানটাকে ভীত আতঙ্কিত করে তুলেছে। হামবার্ট দস্যু বনহুর শব্দটা উচ্চারণ করলো তার সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটা সুইচে চাপ দিলো।

একটা অদ্ভুত ধরণের শব্দ হলো।

অমনি কয়েকজন অনুচর এসে দাঁড়ালো হামবার্টের সম্মুখে। তারা হামবার্টের হাতে ছোরা এবং দক্ষিণ হস্তের বাজুতে তাজা লাল টকটকে রক্ত দেখতে পেয়ে হতভম্বের মত তাকাতে লাগলো।

হামবার্ট কঠিন এবং ভয় বিহ্বল কণ্ঠে বললো—হা করে কি দেখেছো। দস্যু বনহুর আমার চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে।

অনুচরদের মধ্যে জাংচি এবং জিলুংয়াংও ছিলো তারা এক সঙ্গে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—দস্যু বনহুর!

হাঁ এই দেখো, দস্যু বনহুর আমার ঘাটির কোন গোপন স্থানে আত্মগোপন করে আমার প্রতি ছোরা নিক্ষেপ করেছে। কান্দাই থেকে দস্যু

বনহুর জিহাংহায় আমার পিছু ধাওয়া করেছে। সর্বনাশ হয়েছে জিলুংয়াং, সর্বনাশ হয়েছে জাংচি, তোমরা এই মুহূর্তে অনুসন্ধান চালাও।

জিলুংয়াং এবং জাংচি দল বল সহ ছুটলো।

হামবার্ট বসে পড়লো একটা আসনে।

দু'জন অনুচর তার বাজুতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে শুরু করলো।

একজনকে লক্ষ্য করে বললো হামবার্ট—হুংমাকে নিয়ে যাও বন্দীখানায় আটক করে রাখো।

একজন অনুচর হুংমা সহ চলে যায়।

হামবার্ট আসনে বসেও স্বস্তি পায় না, সে অবিরাম চিৎকার করতে থাকে—দস্যু বনহুর যেন পালাতে না পারে। তোমরা সমস্ত ঘাটি ঘেরাও করে সন্ধান চালাও—

মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো। দস্যু বনহুর চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এটা শুধু বিস্ময় নয় এ যেন কল্পনাতীত।

হামবার্ট যন্ত্রণা ভুলে সে নিজেও সন্ধান চালালো। জিলুংয়াং এবং জাংচী তাকে সাহায্যে করলো।

ম্যানেজার হাহাং চও ব্যস্ত সমস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলো। ঘাটির সমস্ত কাজ এক সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হামবার্ট ম্যানেজারকে কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিলো—দস্যু বনহুর চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে তাকে যেমন করে হোক গ্রেপ্তার করতেই হবে। যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে না পারো তাহলে মৃত্যু তোমার অনিবার্য।

ম্যানেজার হাহাংচিও গম্ভীর হয়ে পড়লো, হামবার্ট যে কত বড় হৃদয়হীন সে জানে এবং জানে বলেই তার মুখভাব চিন্তিত হলো।

কয়েক ঘন্টা ধরে চললো দস্যু বনহুরের সন্ধান।

কিন্তু কোথাও দস্যু বনহুরকে পাওয়া গেল না।

হামবার্ট আদেশ দিলো এই মুহূর্তে সমস্ত সুড়ঙ্গ পথ রুদ্ধ করে দাও এবং সুড়ঙ্গ পথে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ো।

হামবার্টের আদেশ পাওয়া মাত্র তার অনুচরগণ সুড়ঙ্গ পথের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়লো। হামবার্ট এবং তার দল বল সবাই একটা বৃহৎ কক্ষের মধ্যে আশ্রয় নিলো।

হামবার্ট বললো—দস্যু বনহুর জানতো না সে কোথায় প্রবেশ করেছে। এবার তার আয়ু শেষ, তাতে কোন সন্দেহ নাই জাংচি?

বলুন মালিক।

সমস্ত সুড়ঙ্গ পথে দশ থেকে পনেরো মিনিটকাল বিষাক্ত গ্যাস আটকে রাখবে তারপর গ্যাস পাইপ যোগে উঠিয়ে নেবে। হাঁ তারই মধ্যে দস্যু বনহুর এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে.....

জাংচি বলে উঠে—ঠিক বলেছেন মালিক এবার দস্যু বনহুর আপনা আপনি শায়েস্তা হবে।

জিলুংয়াং বলে—সে নিজে এসে নিজেই ফাঁদে পড়লো। মালিক আপনাকে ছোরা নিক্ষেপ করার শাস্তি সে হাতে হাতে পেয়ে গেলো।

কিন্তু আমার ব্যথা যে অসহ্য জিলুংয়াং। আমি যে সহ্য করতে পারছিনা।

ম্যানেকার হাহাংচিও বলে উঠে—মালিক মাত্র ক'দিন একটু কষ্ট পাবেন তারপর আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ম্যানেজার তুমি তো বলবেই আসলে আমার কতখানি কষ্ট তা বুঝবেনা। উঃ আঃ আঃ.....ওরে শয়তান দল দেখ দস্যু বেটা মরলো কিনা?

জিলুংয়াং বললো—মাত্র দশ মিনিট বিষ গ্যাস ছাড়া হয়েছে আর দশ মিনিট যেতে দিন। মালিক দস্যু বনহুরের জীবন বড় শক্ত কিনা।

হাঁ যেমন সে সাংঘাতিক তেমনি তাকে শায়েস্তা করা দরকার। সে সুদূর কান্দাই থেকে এসেছে জিহাংহায়। কত বড় ধূর্ত সে কৌশলে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। জাংচি কিওকাকে কান্দাই পাঠানো আমার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

তাই তো মনে হচ্ছে মালিক।

যাক সে জন্যে দুঃখ নাই। হাতের আঘাতটাও আমি হজম করে নেবো। সব জ্বালা আমার মিটবে দস্যু বনহুরকে মৃত অবস্থায় যখন দেখবো তখন। উঃ আঃ আঃ নানা কোন কষ্ট আমার হচ্ছেনা। যাও জিলুংয়াং দেখো বিশ মিনিট কেটেছে কিনা।

ম্যানেজার বলে উঠে—মালিক ঘড়ি আপনার বাম হাতের কব্জিতেই আছে...

দেখতে পারছিনা।

বুঝেছি চোখ আপনার ঘোলাটে হয়ে এসেছে বুঝি?

কতকটা তাই জিলুংয়াং। সব যেন অন্ধকার লাগছে.....হামবার্ট যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে উঠে। পুনরায় বলে সে—জিলুংয়াং এবার বিষাক্ত গ্যাস পাইপের সুইচ অফ করে দাও।

দেবো আরও একটু ছড়িয়ে পড়ুক। দস্যু বনহুরের বড় শক্ত জান কিনা।

কিন্তু জানো না জাংচি বিষাক্ত গ্যাসটা কত বড় মারাত্মক। ওটা যদি কোন ক্রমে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে একটি প্রাণী রক্ষা পাবেনা। আমার সমস্ত ব্লাড ব্যাঙ্ক আর আই ব্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে যাবে। সমস্ত সাধনা আমার ব্যর্থ হবে...

মালিক আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জাংচি তুমি কোথায় যাচ্ছো?

হুংমাকে আপনার নিকটে আনতে যাচ্ছি।

না না ওকেও মরতে দাও।

কেনো হুংমাকে আপনি চান না?

না।

কেনো?

দস্যু বনহুর ওরই সন্ধানে এখানে এসেছে। আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি এবার। জাংচি আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি যে ব্যক্তি হোটেলে রাজার বেশে হুংমার অতিথি হিসাবে ছিলো, যে চিংচুর ছদ্মবেশে ফাংফার সঙ্গে চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে এসেছিলো সেই স্বয়ং দস্যু বনহুর। মাদামচীং তাকে ধরে

নিয়ে গেলেও আটকে রাখতে পারেনি। সে পালিয়ে এসেছে...জাংচি যেওনা, একি আমার নিশ্বাস এমন বন্ধ হয়ে আসছে কেনো?

একটু সবুর করেন বিষাক্ত গ্যাস পাইপের সুইচটা অফ করে দিয়ে আসি।

জিলুংয়াং বলে উঠে—জাংচি তুমি যেওনা। তুমি যেওনা...

হামবার্ট যেন আর্তনাদ করে উঠে—এ কক্ষেও বিষ গ্যাস প্রবেশ করেছে নাকি...

হাঁ মালিক শুধু এ কক্ষেই নয় চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের সমস্ত জায়গায় বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে।

সর্বনাশ এখন উপায় জাংচি তুমিই তাহলে বিষাক্ত গ্যাস পাইপের সুইচ অফ করে দিয়েছো?

হাঁ হামবার্ট আমি।

তুমি

যাকে হত্যার জন্য তুমি বিষাক্ত গ্যাস ছাড়বার আদেশ দিয়েছিলে আমিই সেই...

তুমি তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ।

জাংচি কোথায় তবে?

এক সপ্তাহ আগে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

জিলুংয়াং এবং হামবার্টের সমস্ত অনুচর সহ হামবার্ট তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট ফট করছে। বার বার দু'হাতে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করছে তারা।

বনহুর মুখে মুখোস পরে নিয়েছে।

সে অট্ট হাসি হেসে উঠলো—হামবার্ট মৃত্যু মুহূর্তে শুনে যাও অন্যায় কোন দিন টিকে থাকতে পারেনা। তুমিই হত্যা করবার জন্য বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করেছিলে তুমিই সেই গ্যাসের শিকার হলে।

বনহুর দ্রুত বেরিয়ে আসে এবং হুংমাকে যে কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিলো সেই কক্ষে প্রবেশ করে। দেখতে পায় হুংমার সংজ্ঞাহীন দেহটা

ভূতলে পড়ে আছে। বনহুর দ্রুত হস্তে ওর দেহটা তুলে নেয় হাতের উপর। তারপর লিফটে চেপে বসে।

লিফট খানা সাঁ সাঁ করে ছুটে চলেছে।

বনহুর হুংমার সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধের উপর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চার পাশে তখন বিষাক্ত গ্যাস ধুম্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

❑

ভয় নেই বনহুর হুংমার মৃত্যু হবেনা। এই ঔষধটা ওকে খাইয়ে দাও এবং এটা ওর নাকে ধরো। হুয়াংচু দু'টো শিকড় জাতীয় ঔষধ হাতে দিলো বনহুরের।

বনহুর শিকড় দু'টো নিয়ে হুংমার পাশে এগিয়ে গেলো।

ভূতলে শায়ীত হুংমা।

চোখ দু'টো তার মুদিত। একরাশ এলোমেলো চুল ছড়িয়ে আছে ওর চোখে মুখে কাঁধে। হুংমার দেহে সেই পূর্বের পোশাক। যে পোশাক সে পিউল পাং হোটেলে পরতো। বিশেষ করে তার পোশাক ছিলো কতকটা পুরুষের মত। প্যান্ট সার্ট জুতো মোজা ব্যবহার করতো হুংমা।

হুয়াংচু বললো—বৎস আমি জানতাম তুমি পারবে। শয়তান হামবার্ট এবং তার ঘাটি তুমি ধ্বংস করেছো। ভেংগে চুরমার না হলেও চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরের সমস্ত কিছু বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে আই ব্যাঙ্কের চোখগুলো নষ্ট হয়ে গেছে ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত। মরেছে হামবার্ট এবং তার সহকারীগণ। একটি প্রাণীও সেখানে জীবিত নাই। বনহুর যে বিষাক্ত গ্যাসের অসীম শক্তি দ্বারা হামবার্টের সমস্ত শক্তি বিনষ্ট করেছো সে শক্তির একটি কাজ আছে যা যুগযুগ থাকবে।

বনহুর অবাক হয়ে শুনছিলো বললো—হুয়াংচু তুমি কি বলছো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না?

বনহুর শুনে রাখো যে গ্যাসের দ্বারা আজ হামবার্ট এবং তার দল বল নিহত হলো ঐ গ্যাসের এক অদ্ভুত শক্তি আছে। কোন দিন ঐ মৃতদেহগুলো পচে গলে যাবে না—হাজার হাজার বছর পরেও ঐ চীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে শব দেহগুলি ঠিক তেমনি থাকবে যেমন আছে এখন।

বনহুরের মনে পড়ে কোন এক দ্বীপের সেই অদ্ভুত আলোক রশ্মির কথা। বহু নাবিক সেই আলো দেখেছে কিন্তু কেউ কোন দিন সেই দ্বীপে নেমে দেখার সাহস পায়নি। গভীর রাতে দ্বীপের বুকে দেখা নীলাভ আলোক রশ্মি। বনহুর সেই দ্বীপে গিয়েছিলো এবং ভূগর্ভে আবিষ্কার করেছিলো এক অদ্ভুত সৃষ্টি। মাটির তলায় কোন এক সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করেছিলো সে, দেখেছিলো অগণিত সব দেহ। কতযুগ পূর্বের সে সব মৃতদেহগুলি তবু পঁচে গলে যায়নি। শুকনো মাছের মত শক্ত হয়েছিলো।

হুয়াংচু বলে—হাঁ যুগযুগ পরেও নর পশু হামবার্ট তেমনি থাকবে। তেমনি থাকবে তার কু'কুর্মের নিদর্শনগুলো। দেরী করোনা বনহুর তাড়াতাড়ি হুংমাকে ঔষধ খাইয়ে দাও এবং ওর নাকে ঐ ঔষধ ধরো।

বনহুর বললো—হাঁ আমি তাই করছি।

হুয়াংচু বিদায় গ্রহণ করে।

বনহুর এগিয়ে আসে হুংমার কাছে। হুয়াংচুর দেওয়া ঔষুধের শিকড় নিয়ে ওর নাকের কাছে ধরে। কিন্তু যে ঔষধটা খাওয়াতে হবে ওটা ওকে খাওয়াবে কেমন করে। বনহুর শিকড় হাতে রগড়ে রস তৈরি করে নেয় তারপর ওর মুখ খানা উঁচু করে ধরে।

বনহুর হুংমার মুদিত আঁখি দুটির দিকে চেয়ে থাকে নির্বাক হয়ে, ফুলের মত সুন্দর একটি মুখ। বনহুর ও মুখটা ধরে ঠোঁট দু'টো একটু ফাঁক করে শিকড়ের রসটা খাইয়ে দেয়। একটা অনুভূতি নাড়া দেয় বনহুরের শিরায় শিরায়।

কিন্তু না তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে চলবে না, সে হুংমাকে ভালবাসে কিন্তু ওকে সে পাপ বাসনা নিয়ে স্পর্শ করতে পারে না।

বনহুর সরে বসে হুংমার পাশ থেকে।

রাত্রি তখন গভীর।

নির্জন কক্ষ।

হুংমার সংজ্ঞা এখনও ফিরে আসেনি।

বনহুর অদূরে একটা দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

হঠাৎ হুংমা বলে উঠে—পানি পানি—দাও।

বনহুর পাশের গেলাস থেকে পানি নিয়ে ওর মুখে দেয়। খুশি হয় বনহুর যা হোক হামবার্টের বিষাক্ত গ্যাসে হুংমার তা হলে মৃত্যু ঘটেনি।

হুংমা তাকায় এবার অস্ফুট কণ্ঠে বলে সে—আমাকে আমার বাবার হোটেলে পৌঁছে দাও.....

বনহুর ঝুকে পড়ে বলে—হাঁ তোমাকে তোমায় বাবার হোটেলে পৌঁছে দেবো হুংমা।

কে কে তুমি?

রাজা।

রাজা তুমি! তুমি ফিরে এসেছো?

হাঁ হুংমা।

হুংমা দু'হাতে বনহুরের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে—রাজা আর আমি তোমায় যেতে দেবোনা। রাজ.....

বনহুর হেসে বলে—বেশ আমি আর যাবোনা। তুমি এবার ঘুমাও কেমন?

ঘুমাবো?

হাঁ কিন্তু তুমি আবার পালিয়ে যাবে না তো?

না হুংমা।

ঐ শয়তানটা কোথায়। ও আবার আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না তো?

না। ও চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

বিদায় নিয়েছে মানে?

মানে চলে গেছে আর তোমাকে পাকড়াও করতে আসবে না।

সত্যি?

হাঁ হুংমা তুমি এখন ঘুমাও।

তুমি ঘুমাবে না?

ঘুমাবো।

আমার পাশে শোবেনা তুমি?

না ঐ ওখানে.....বনহুর উঠে গিয়ে মেঝেতে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

❑

খট করে শব্দ হতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় মনিরার। সেই ঘটনার পর থেকে মনিরার চোখের ঘুম যেন কোথায় উবে গেছে। হঠাৎ তন্দ্রা এলেও সব সময় সজাগ থাকে ওর মন। না জানি আবার কখন আসবে সে। শব্দটা কানে যেতেই সন্তর্পণে উঠে বসে মনিরা তার বিছানায়।

পাশের ঘরে জানালা গলিয়ে কে যেন ভিতরে প্রবেশ করলো। জুতোর মৃদু শব্দ হচ্ছে কিন্তু এ শব্দটা তো তার স্বামীর জুতোর শব্দ নয়। কেমন যেন অপরিচিত এ আওয়াজ। তার স্বামীর বুটের আওয়াজ যে তার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। তা ছাড়া সে তো ও ঘরে প্রবেশ করবে না। এসে সে প্রথম তারই কক্ষে আসবে। তাবে কি সে নয়।

মনিরা কান পাতে।

হাঁ জুতোর মৃদু শব্দ হচ্ছে।

অতি আলগোছে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে ও ঘরে। তবে কি চোর কিন্তু চোর এলে মোম জ্বেলে সে নূরকে দেখতে যাবে কেনো। মনিরার মনে সন্দেহ জাগলো। বিছানা ছেড়ে সে উঠে এলো, ধীরে ধীরে এগুলো সে পাশের ঘরে যাওয়ার মাঝের দরজার দিকে।

কিছুটা এগুতেই হঠাৎ চমকে উঠলো মনিরা, সমস্ত দেহ জমকালো পোশাকে আচ্ছাদিত কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে নূরের বিছানার পাশে।

ডিম লাইটের স্বল্প আলোতে তাকিয়ে আছে জমকালো মূর্তি নূরের মুখের দিকে। যদিও জমকালো মূর্তি এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো তবু মনিরা বেশ বুঝতে পারে। আরও অনুমান করে মনিরা এ জমকালো মূর্তি তার স্বামী নয়, কারণ বনহুরের মত দীর্ঘ দেহী নয় জমকালো মূর্তি।

মনিরা পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় জমকালো মূর্তির পাশে। সঙ্গে সঙ্গে বলে—কে তুমি?

জমকালো মূর্তি দ্রুত পালিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই মনিরা পিস্তল চেপ ধরে তার পিঠে।

মনিরা এ ঘরে আসার সময় টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করে এনেছিলো পিস্তল খানা। পিস্তল চেপে ধরায় পালাতে পারে না জমকালো মূর্তি।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগ এবং নূর জেগে উঠেছিলো। তাদের চোখেও মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। যদিও তারা ভয়ে আরষ্ট হয়ে গেছে তবু কেউ কোন শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মনিরা বললো—কে তুমি।

জমকালো মূর্তি নীরব।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করে মনিরা—বলো কে তুমি আর এখানে কেনো এসেছো।

নূর বলে উঠে—আম্মি এই জমকালো মূর্তিই আমি সেদিন দেখে ছিলাম।

মরিয়ম বেগমও বললেন—হাঁ একেই সেদিন আমি পলিয়ে যেতে দেখেছি। নূর শীগগীর পুলিশের কাছে ফোন করে দে...

নূর রিসিভার হাতে তুলে নিতে যাচ্ছিল।

মনিরা বলে উঠে—থামো নূর। একে আমি চিনি।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করে নূর—আম্মি তুমি ওকে চেনো? কে ও?

মরিয়ম বেগমও অবাক হয়ে বলেন—মনিরা তুই ওকে কবে দেখেছিস তাই চিনতে পারলি?

হাঁ মামীমা আমি ওকে চিনি। তুমিও চেনো। মনিরা ওর মুখ থেকে কালো পাগড়ীর আঁচল খানা সরিয়ে বললো—মামীমা ওকে চিনতে পেরেছেন।

একি এযে ফুল। বিস্ময় ভরাকণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম।

এক সময় নূরী ফুল নাম নিয়ে এ বাড়িতে এসেছিল নূরকে দেখাশোনা করার জন্য। নূরের অবশ্য মনে নেই, সে অনেকদিন আগের কথা।

মরিয়ম বেগম বলেন—তুমি। তুমি কি মনে করে এখানে এসেছো?

মনিরা বললো—নূর তুমি ওদিকে যাও।

নূর মায়ের কথায় কিছুটা আশ্চর্য হয় তবু সে চলে যায় সেখান থেকে।

মনিরা রাগত কণ্ঠে বলে—কথা বলছোনা কেনো? জানি তুমি কেনো এসেছো? আমার স্বামীর পিছু নিয়েছিলে আবার আমার ছেলেকে.....

এবারে নূরী কথা বলে—আপনাকে আমি বড় বোনের মত শ্রদ্ধা করি তাই আপনার কথাগুলো আমি হজম করে গেলাম। কিন্তু মনে রাখবেন নূর শুধু আপনার সন্তান নয় সে আমারও সন্তান। কথাটা বলেই নূরী ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়।

মনিরা পিস্তল হাতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মরিয়ম বেগম উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠে—নূর ছুটে আয় ও পালিয়ে গেছে। ওরে ও পালিয়ে গেছে...

নূর দ্রুত এলো, কিন্তু ততক্ষণে নূরী চলে গেছে। বাইরে রাজ পথে শোনা যায় অশ্বপদ শব্দ। নূর বললো—আম্মি কে ঐ মেয়েটা?

জানিনা।

দাদী আম্মা তুমি বললে ওর নাম ফুল? কে ঐ ফুল বলো দাদী আম্মা।

তুই ছোট ছিলি তখন তোর আব্বু ওকে এনেছিলো তোর দেখা শোনা করার জন্যে ও তোকে খুব ভালবাসতো জানিস নূর?

সত্যি দাদী আম্মা ওকে আমার খুব ভাল লেগেছে। কেমন মায়া ভরা চোখে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে।

হাঁ তোকে চুপি চুপি দেখতে এসেছিলো।

ঠিক বলছো দাদী আম্মা ফুল আমাকে স্নেহ করে...

মামীমা তুমি ওর কথা তুলে নূরের মন নষ্ট করনা। নূর ওকে চেনেনা...

আম্মি ওতো কোন ক্ষতি করেনি তুমি কেনো ওকে বকলে?

বকবোনা একশোবার বকবো। চোরের মত যে চুপিচুপি আসে সে কোনদিন ভাল হতে পারে না।

আম্মি হয়তো প্রকাশ্যে এলে তুমি তাকে স্বচ্ছ মনে গ্রহণ করতে পারবে না তাই সে চুপিচুপি এসেছিলো। কি সুন্দর ওর নামটা ফুল। ঠিক ফুলের মতই সুন্দর।

নূর এখন ঘুমোতে যাও।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারেন আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না তাই তিনি বলেন—যা দাদু শুয়ে পড়। নিজেও তিনি শুয়ে পড়লেন।

নূর বিছানার দিকে এগিয়ে যায়।

মরিয়ম বেগম শুয়ে শুয়ে ভাবেন মেয়েটি কেনো এসেছিলো। নূরকে দেখতে এসেছিলো তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেনো নূরকে সে দেখতে আসে। নূরকে ফুল ভালোবাসতো জানেন মরিয়ম বেগম, এটাও জানেন—মনিরা ফুলকে কেনো যেন সহ্য করতে পারে না। এলোমেলো একরাশ চিন্তা তার মাথার মধ্যে ঘুর পাক খেতে থাকে।

মনিরাও শয্যা গ্রহণ করে কিন্তু বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে সে। বহুদিন পর আবার ও কেনো নতুন করে উদয় হলো। নূরকে সে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে চায় নাকি? যেমন তার স্বামীকে ঐ মেয়েটি বশ করতে চেয়েছিলো ওর প্রতি মনিরার মনে একটা সন্দেহের ছোঁয়া ছিলো।

ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে মনিরা।

নূরী তখন তার আস্তানায় এসে পৌছে।

অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াতেই রহমান এসে দাঁড়ায় নূরীর পাশে। বলে রহমান—নূরী আজও তুমি কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গিয়েছিলে, না?

হাঁ, রহমান ভাই।

কিন্তু এ ভাবে যাওয়াটা তোমার মোটেই উচিৎ নয় নূরী। জানোতো ও বাড়ির উপর সদা সর্বদা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।

জানি রহমান ভাই তবু পারি না নিজকে ধরে রাখতে। নূর যেন আমার নয়নের মণি। জাভেদের চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়। সে যে আমার হুরের সন্তান.....

নূরী কথাগুলো বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে যায়।

রহমান নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নূরীর মুখের দিকে।

কান্দাই আস্তানায় তখন ভোরের বাতাস বইতে শুরু করেছে।

নাসরিন তার কন্যা ফুল্লরাকে নিয়ে এগিয়ে আসে। কন্যাকে নিয়ে নাসরিন অতি ভোরে ফুল সংগ্রহ করতে গিয়েছিলো।

নূরী ফুল্লরাকে টেনে নেয় কাছে তারপর ওর গালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে আদর করে।

ফুল্লরা এখন ছোট নেই বেশ বড় হয়েছে ছুটোছুটি করে বেড়াতে শিখেছে। কিছুটা ফুল নিয়ে এগিয়ে ধরে—বড় আম্মু ফুল নেবে?

ফুল্লরা নূরীকে বড় আম্মু বলতো আর নাসরিনকে আম্মু বলতো।

নূরী ফুল্লরাকে আদর করে হাসনু বলে ডাকতো। কারণ ফুল্লরা খুব হাসতো।

নূরী বললো—দাও হাসনু আমাকে ফুল দেবে দাও।

নূরীর দু'হাতে ফুল ভরে দেয় হাসনু।

এবার এগিয়ে চলে ওরা আস্তানার ভিতরে।

পূর্বাকাশে তখন ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

গুহায় প্রবেশ করতেই জাভেদ উঠে বসে তাকায় মায়ের দিকে—আম্মি তুমি আজও বাইরে গিয়েছিলে?

হাঁ আম্মু।

রোজ তুমি কোথায় যাও আম্মি?

তোর বড় ভাইয়াকে দেখতে গিয়েছিলাম।

বড় ভাইয়া?

হাঁ, তোর আর একজন বড় ভাইয়া আছে।

সত্যি বলছো আম্মি, আমার বড় ভাইয়া আছে?

হাঁ।

তবে এখানে আসেনা কেনো?

সে শহরের মানুষ।

ওঃ।

জাভেদ জানে শহরের মানুষ কোনদিন জঙ্গলে আসেনা আবার জঙ্গলের মানুষ কোনদিন শহরে যায় না। তাই সে মাকে আর কোনো প্রশ্ন করে না।

❑

ভোরের আলো মুখে পড়তেই ঘুম ভেংগে যায় হুংমার। ধড় মড় করে উঠে বসে তাকায় সে কিন্তু একি সে যে তাদেরই হোটেল পিউলপাং এ নিজের কক্ষে শুয়ে আছে। রাজা কোথায়, তাকে তো সে দেখতে পাচ্ছেনা। হুংমা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করে ডাকে—রাজা...রাজা...রাজা...

রাজা তখন জাহাজ ঈগলের একটি ফাষ্ট ক্লাশ ক্যাবিনের সোফায় বসে সিগারেট পান করে চলেছে। একরাশ ধুম্রকুন্ডলি তার চার পাশে ঘুর পাক খাচ্ছিলো। তাকিয়ে আছে সে উদাস নয়নে সাগরের উত্তাল জলরাশির দিকে।

চীন সাগর অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে ঈগল। জাহাজ ঈগল চীন সাগরের সবচেয়ে বড় এবং দ্রুতগামী। এ জাহাজে প্রায় একশত জন নাবিক রয়েছে। আর খালাসী রয়েছে বহু।

যাত্রী প্রায় আট নয় হাজার।

যাত্রীদের জন্য সব রকম আমোদ প্রমোদ এবং খেলা ধুলার ব্যবস্থা আছে এ জাহাজে। হোটেল, সিনেমা হল, লাইব্রেরী, কোন কিছুর অভাব নেই।

বনহুর এখন নিশ্চিন্ত।

কান্দাই ফিরে চলেছে সে।

জিহাংহায় কাজ তার শেষ হয়েছে।

যাদুকর হুয়াংচুকে বনহুর প্রাণ ভরে ধন্যবাদ জানায়। সে তাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। যাদুকর হলেও তার মহৎ হৃদয় আছে। যার জন্য সে বনহুরকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলো, পুত্র সমতুল্য স্নেহে তাকে সহায়তা করেছে।

হামবার্ট এবং তার সর্বনেশে সাধনা কেন্দ্রগুলো বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা সমূলে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে এটা তার জীবনে এক চরম সার্থকতা।

বনহুর যখন হুয়াংচুকে নিয়ে ভাবছে তখন জিহাংহায় মাদামচীং মরণ বান অস্ত্র নিয়ে পিতার সম্মুখে এসে হাজির।

হুয়াংচুকে লক্ষ্য করে বলে মাদামচীং—বাবা তুমি যাদুবিদ্যায় আমার চেয়ে বড় হতে পারো কিন্তু নাগ সাধনায় আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় মনে রেখো। বাবা যদি মঙ্গল চাও তবে আমার শিকার তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছো ফেরৎ দাও।

হুয়াংচু বিকট স্বরে হেসে উঠে—তোমার শিকার? হাঃ হাঃ হাঃ সে এখন বহুদূরে।

বহুদূরে মানে?

জিহাংহার বাইরে চলে গেছে সে।

বাবা।

হাঁ মাদাম তোমার কুৎসিত বাসনা আর সিদ্ধ হবে না তোমাকে আমি হীমাগারে বন্দী করলাম। তুমি আর কোনদিন হীমাগার থেকে পৃথিবীর আলোতে বের হতে পারবে না। তোমার শেষ পরিণতি হবে কংঙ্গার হাতে মৃত্যু।

বাবা।

মাদামচীং এর চার পাশে তখন লৌহ শিকলের বেড়াজাল পড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যাচ্ছে হীমাগারের দিকে।

মাদামচীং চিৎকার করে উঠে—বাবা তুমি আমাকে হীমাগারে বন্দী করে রাখো কিন্তু কংঙ্গার হাতে তুলে দিওনা।

ততক্ষণে মাদামচীং হীমাগারে আটকা পড়ে গেছে।

পরবর্তী বই

সাইক্লোনের কবলে দস্যু বনহুর

সাইক্লোনের কবলে দস্যু বনহুর-৬৮

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলো ঈগল।

সোফাসহ উল্‌টে পড়তে পড়তে সামলে নিলো বনহুর নিজেকে। ভীষণ একটা শব্দ হলো পরক্ষণেই, আর্তচিৎকার এবং করুণ কান্না কানে ভেসে এলো তার। বনহুর হঠাৎ বুঝতে পেরে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন থেকে।

ক্যাবিনের বাইরে আসতেই কে যেন পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরলো।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিলো ঈগল জলদস্যুর কবলে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে বনহুর চালালো ঘুষির পর ঘুষি। যে লোকটা বনহুরকে জাপটে ধরেছিলো সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো জাহাজের মেঝেতে।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আরও দু'জন এসে তাকে আক্রমণ করলো। দু'জনের হাতেই ধারালো অস্ত্র। বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু'জনকে বাধা দিলো, ধরে ফেললো জল দস্যুদের অস্ত্রসহ হাত দু'খানা। এমন বলিষ্ঠতার সঙ্গে বনহুর ওদের হাত দু'খানা ধরে ফেলেছে এক চুল নড়তে পারলোনা দস্যুদ্বয়। ওদের হাতের ছোরা দুটো খসে পড়লো জাহাজের ডেকে।

বনহুর এবার ওদের হাত মুক্ত করে দিয়ে একজনকে তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলো সাগর বক্ষে। পরক্ষণেই আর একজন পাল্‌টা আক্রমণ করলো বনহুরকে, বনহুর তাকেও তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলো সাগরের জলে।

প্রবল জলরাশির অতলে তলিয়ে গেলো লোক দু'টো।

বনহুর যেমন ফিরে তাকাবে। অমনি এক সঙ্গে দশ বারো জন আক্রমণ করলো বনহুরকে ভীষণভাবে।

তখন সমস্ত জাহাজময় একটা আর্তচিৎকারে ভরে উঠেছে। বনহুর দশ বারো জন দস্যুর সঙ্গে সমানভাবে লড়াই করে চললো। কৌশলে সে একজনের হাত থেকে একটি ছোরা কেড়ে নিয়েছিলো। কয়েকজন জলদস্যুকে বনহুর নিহত করলো।

কিন্তু সে একা আর জলদস্যুর সংখ্যা ছিলো প্রায় একশত জনের বেশি। সকলের হাতেই ছিলো অস্ত্র।

বনহুরকে ওরা এক সময় গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো।

একজন বনহুরের বুকে একটি সূতীক্ষ্ণ ছোরা বসিয়ে দিতে যাচ্ছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক বলে উঠে—থামো।

ছোরা সহ হাতখানা থেমে যায়।

বলিষ্ঠ চেহারার লোকটা আদেশ দেয় ওকে বেঁধে ফেলো।

বনহুরকে দশ বারো জন লোক রশি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলে। বনহুর অগত্যা নিশ্চুপ থাকতে বাধ্য হলো।

সমস্ত জাহাজখানায় জলদস্যুরা চালালো লুটতরাজ। হত্যা করলো ওরা অনেককে। বন্দী করে নিলো কিছু সংখ্যক লোককে। বনহুরকেও ওরা বন্দী করে নিয়ে চললো অপর একটি জাহাজে।

কয়েকটি তরুণীকেও জলদস্যুরা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে চললো।

কিছু সময়ের মধ্যে ঈগলের বুকে ঘটে গেলো এক বীভৎস কান্ড। কতকগুলো রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে রইলো বিক্ষিপ্তভাবে ঈগলের সর্বত্র।

করুণ কান্না আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে চারদিক।

ঈগলের বুক থেকে জলদস্যুরা মাল নিয়ে তাদের জাহাজে পার হয়ে যাচ্ছে। একটা বড় আকারের তক্তা এ জাহাজ থেকে ও জাহাজে সাঁকোর মত করে রাখা হয়েছিলো। বনহুরকে ওরা রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলে এ তক্তাখানার উপর দিয়ে।

জলদস্যুদের জাহাজখানা ও আকারে বেশ বড়। বনহুরকে জলদস্যুরা এনে একটি ক্যাবিনে আটক করে রাখলো।

যে ক্যাবিনে বনহুরকে বন্দী করে রাখা হলো সেই ক্যাবিনের পাশেই ছিলো জলদস্যুদের দলপতির ক্যাবিন। বনহুর পাশের ক্যাবিন থেকে শুনতে পাচ্ছিলো সেই কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর বলে ছিলো, 'থামো ওর বুকে ছোরা বসিয়ে দিও না'। আমার বোঝাপড়া আছে ওর সঙ্গে।

বনহুর শুনতে পেলো সেই কণ্ঠে জাহাজ ছাড়ার আদেশ।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত জাহাজখানা দুলে উঠলো।

ঝক্ ঝক্ ঝক্.....

একটানা অদ্ভুত শব্দ করে জাহাজখানা চলতে শুরু করলো। বনহুর বন্ধ ক্যাবিনের মেঝেতে বসে ভাবছে এ অবস্থার শেষ কি এবং কোথায় কে জানে। তার হাত দু'খানা মোটা রশি দিয়ে পিছ মোড়া করে বাঁধা, সমস্ত শরীরে রশি জড়ানো।

বনহুরের কপালে এক জায়গায় একটি ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। জামার কয়েক স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। জামাটা ছিড়েও গেছে কয়েক স্থানে।

জাহাজখানা এখন কোন দিকে কোথায় চলেছে সে জানে না। তবু বুঝতে পারে এবার জাহাজখানা তাদের ঘাঁটি অভিমুখে চলেছে। বনহুর বেরিয়েছিলো জিহাংহা থেকে সোজা সে ফিরে আসবে আস্তানায়। কতদিন সে নিজের অনুচরদের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে। রহমান কি ভাবে তার অনুপস্থিতিতে কাজ করছে—তবে বনহুরের ভরসা আছে, রহমান আস্তানায় থাকলে তার অভাব তেমন করে অনুচররা বুঝতে পারে না। কাজ কর্ম ঠিকভাবেই সমাধা হয়ে থাকে। তবু মাঝে মাঝে আস্তানার জন্য মন অস্থির হয় বনহুরের, কত দিন নূরীকে সে পাশে পায়নি। কতদিন মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। নূরীর জন্য বেশি চিন্তা হয় না কারণ নূরী জানে এবং বোঝে বনহুর অকারণে আস্তানা ছেড়ে কোথাও থাকে না। মনিরা বড় অভিমানিনী, তাকে নিয়ে বেশি ভাবনা বনহুরের, ফিরে এলে কিছুতেই সে তাকে স্বাভাবিক মনে গ্রহণ করবে না। কত মান অভিমান চলবে, কত অনুরোধ কত কাতর মিনতির পর হয়তো কথা বলবে সে। নূরের কৈফিয়ৎ তো রয়েছেই, এখন সে বেশ বড় হয়েছে বুঝতে শিখেছে। কেন তার আব্বু বাড়ি থাকে না, কোথায় থাকে, কোথায় যায় এসব চিন্তা তার মনে প্রশ্ন জাগায়। জাবেদ এখনও বাচ্চা তবু সে তার মাকে প্রশ্ন করে—আব্বু কোথায় যায়। নূরী নানা কথা বলে তাকে ভুলিয়ে রাখে। সবচেয়ে মায়ের মুখখানা বনহুরের বেশি করে মনে হয়, পিতা নেই একমাত্র মা-ই তার শ্রদ্ধেয়া.....

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পাশের কেবিন থেকে ভেসে আসে নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ—বাঁচাও, বাঁচাও, না না আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা...ছেড়ে দাও নরপশু আমাকে তুমি ছেড়ে দাও.....

বিকট অট্টহাসির আওয়াজ তলিয়ে দেয় করুণ নারীকণ্ঠটিকে। মনে পড়ে হামবার্টের কবলে হুংমার করুণ আর্তনাদের কথা। বনহুরের সমস্ত দেহ সজাগ হয়ে উঠে। শিরায় শিরায় উষ্ণ হয়ে উঠে তার রক্তধারা। ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে আসে। মুষ্ঠিবদ্ধ হয় তার দক্ষিণ হাত খানা। বুঝতে পারে জলদস্যু সর্দার কোন বন্দী নারীর উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। না জানি কে সে রানী কার স্ত্রী নতুবা বোন বা কন্যা কে জানে।

পুনরায় আর্তকণ্ঠস্বর—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও...শয়তান...উঃ, মা...মা বাঁচাও...বাঁচাও...

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, যদিও তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা তবু সে ক্যাবিনের দরজায় পা দিয়ে প্রচণ্ড লাথি দেয়। একবার, দু'বার, তিন বার, সঙ্গে সঙ্গে দরজা ভেংগে যায়। বনহুর দ্রুত প্রবেশ করে পাশের ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই দেখতে পায় জলদস্যু সর্দার একটি বিশ বাইশ বছর বয়স্ক তরুণীকে মেঝেতে ফেলে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। তরুণী প্রায় বিবস্ত্র, এলামেলো চুল। চোখে মুখে ভীত আতঙ্কিত ভাব। প্রাণপণ চেষ্টায় সে নিজকে জলদস্যুর কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছে।

বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই জলদস্যু সর্দার তরুণীকে মুক্ত করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে—কি করে ক্যাবিন থেকে বের হলে?

শয়তান, যেমন করে মানুষ বের হয় তেমনি করে। খবরদার ঐ মেয়েটির শরীরে হাত দিও না। বনহুর কথাগুলো বলে তাকালো তরুণীর দিকে।

তরুণী তার ভুলুণ্ঠিত বস্ত্রখানা তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ শরীরখানায় জড়িয়ে নিচ্ছিলো।

জলদস্যু সর্দার হুঙ্কার ছাড়লো—কোরা-মাধা-বাঘা তোমরা কোথায়?

একসঙ্গে তিনজন জলদস্যু প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। বন্দীকে সেই ক্যাবিনে দেখে ওরা অবাক হলো, ঢোক গিলে বললো একজন —ওস্তাদ.....

তোমরা কোথায় ছিলে? বন্দী কি করে বের হলো তার ক্যাবিন থেকে। জলদস্যু সর্দার গর্জন করে বললো।

মাথা চুলকালো ওরা সবাই।

মুখ চাওয়া-চাওয়ী করে একজন বললো—ওস্তাদ আমরা ঠিকমত আমাদের ডিউটি করছিলাম, বন্দী কেমন করে বের হলো জানিনা।

হুঙ্কার ছাড়লো—নিয়ে যাও এবার ভাল করে আটকে রাখো। যাও.....

এরা তিনজন একসঙ্গে বনহুরকে ধরতে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পা দিয়ে আঘাত করলো এক জনকে।

লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই তার আঘাতে অপর দুজন পড়ে গেলো।

বনহুর বললো—জলদস্যু সর্দার সাবধান ওর দেহ তুমি স্পর্শ করোনা.....

বনহুরের কথায় অট্টহাসি হেসে উঠলো জলদস্যু সর্দার।

ততক্ষণে ওরা তিনজন বনহুরকে পাকড়াও করে ফেলেছে।

বনহুর কোন প্রতিবাদ করলো না এবার। সে নীরবে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় একবার অসহায় তরুণীটির দিকে তাকিয়ে দেখলো।

তরুণী দু'চোখে বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। বনহুরকে ওরা বের করে নিয়ে যেতেই তরুণী ছুটে এলো, বনহুরের পিছনে পিছনে সে বেরিয়ে যাবে সেই ক্যাবিন থেকে কিন্তু তার পূর্বেই জলদস্যু সর্দার ধরে ফেললো তরুণীটিকে। যেমন ব্যাঘ্র হরিণ শিশুকে এক থাবায় টেনে নেয় তেমনি করে জল দস্যু সর্দার তরুণীটিকে টেনে নিলো নিজের কাছে।

বনহুরকে ওরা নিয়ে যাচ্ছিলো তার ক্যাবিনে আটকে রাখার জন্য। বনহুরের কানে এলো তরুণীর করুণ চিৎকার। বনহুর মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, ইচ্ছা করলে সে এই বন্ধন অবস্থাতেও তিন জনকে কাবু করতে পারে কিন্তু সে ইচ্ছা করেই চুপ করে রইলো।

বনহুরকে ওরা বন্দী করে রাখলো মজবুত করে তারপর বেরিয়ে গেলো। দু'জন পাহারা রইলো ক্যাবিনের দরজার দু'পাশে।

বনহুরের কানে এলো করুণ আর্তনাদ।

দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর। সে বুঝতে পারলো তরণীকে রক্ষা করা সম্ভব হলোনা। হতাশ হয়ে বসে পড়লো বনহুর মেঝেতে।

জলদস্যু সর্দারের ক্যাবিন থেকে নারী কণ্ঠের একটা গোঙ্গানীর শব্দ কানে ভেসে আসে বনহুরের।

❑

গভীর রাতে বনহুরের তন্দ্রার মত এসেছিলো হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে যায়। বনহুরের কানে আসে ঝুমুরের শব্দ। জলদস্যু সর্দারের ক্যাবিন থেকেই শব্দটা আসছে তার সঙ্গে জড়িত কণ্ঠস্বর—নাচো আরও নাচো...

অপর একটি কণ্ঠ—বহুৎ খুব সুরৎ নাচ। ওস্তাদ সুরমা বাই এতো ভাল নাচতে পারে আগে জানা ছিলোনা। ওর নাচ বহুৎ দেখেছি কিন্তু আজ এতো সুন্দর নাচছে.....

সর্দারের কণ্ঠস্বর—আজ সুরমার মোটা বখশীস মিলেছে তাই... আরও বখশীস মিলবে।

ওস্তাদ নতুন মেয়েটিকে সুরমা নাচ শেখাবে।

হাঁ ঠিক কথা বলেছো সোরাব হোসেন। নতুন মেয়েটাকে নাচ শিখাতে হবে। কথার ফাঁকে শোনা গেলো জল দস্যু সর্দারের কণ্ঠস্বর।

নূপুর ধ্বনি থামলো সঙ্গে সঙ্গে কর ধ্বনি শোনা গেলো তার সঙ্গে শোনা গেলো নারী কণ্ঠের খিল-খিল হাসির আওয়াজ।

ওরা সারাব পান করেছে এবং নর্তকি বা নাচনে ওয়ালীকে নিয়ে আমোদ প্রমোদে মেতে উঠেছে! জাহাজ চলার একটানা শব্দও ভেসে আসছে তার কানে।

বনহুর শুনতে পেলো জলদস্যু সর্দারের জড়িত কণ্ঠস্বর—যাও এবার তোমরা আরাম করো গে তার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো টেবিলে গেলাস রাখার শব্দ।

হয়তো বা সারাবের গেলাস রেখে উঠে দাঁড়ালো জলদস্যু সর্দার।

বনহুর ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো একটু তবে একেবারে ঘুম নয় তন্দ্রাচ্ছন্ন বলা চলে। হাত দু'খানা পিছ মোড়া অবস্থায় বাঁধা থাকায় বনহুরের বেশ কষ্ট হচ্ছিলো তাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ

সব কষ্ট সহ্য করার মত অভ্যাস তার ছিলো—তাই সে বেশি কাতর হয়ে পড়েনি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো সে ক্যাবিনের এক পাশে। যেদিক থেকে পাশের ক্যাবিনের কথাগুলো ভেসে আসছিলো। বনহুর তাকালো সম্মুখের শার্শীর ফাঁক দিয়ে ওপাশে। যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা অতি ঘৃণ্য, বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবলো কেমন করে এই জলদস্যুদের কাবু করা যায়। কেমন করে এদের সে শায়েস্তা করবে। সেই তরুণীর করুণ মুখখানা ভেসে উঠে বনহুরের চোখের সামনে। অসহায় তরুণী কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারলোনা শয়তান জলদস্যু সর্দারের কবল থেকে। নিশ্চয়ই ঐ তরুণীটিকে জাহাজ ঈগল থেকে ধরে আনা হয়েছে। হয়তো বা হত্যা করা হয়েছে ওর পিতামাতা বা স্বামীকে তারপর ওকে নিয়ে এসে তার উপর চালাচ্ছে পাশবিক নির্যাতন। সেদিন ঈগলের হামলার কথা মনে করে বনহুরের ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠে। বনহুর পায়চারী করে চলে ক্ষিপ্রভাবে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় ওপাশে একটা ধারালো লম্বাটে বস্তুর উপর। জিনিসটা একটা ত্রিফলা আকারের অস্ত্র।

বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠে, একটা প্রসন্নতার ছাপ। বনহুর ত্রিফলা আকারের অস্ত্রটা দিয়ে ক্যাবিনের দেয়ালে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয় তারপর পিছন ফিরে বন্ধন মুক্ত হাত দু'খানা ঘষতে থাকে ধীরে ধীরে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাত দু'খানা মুক্ত হয়ে যায় বনহুরের। সে এবার নিজের দেহ থেকে দড়িগুলো খুলে ফেলে দেয় এক পাশে। বনহুর এবার এগিয়ে যায় সেই শার্শীর পাশে। পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর পাশের ক্যাবিনে। এখনও ক্যাবিনে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ভালভাবে তাকাতেই দেখতে পায় জলদস্যু সর্দার চীৎ হয়ে পড়ে আছে তার শয্যায়। পাশে কয়েকটা বোতল এবং কাঁচ পাত্র।

সারাব পান করে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। নাসিকা ধ্বনি হচ্ছে রীতিমত। বনহুর ক্ষীপ্রতার সঙ্গে কাঁচের শার্শীর কপাটগুলো কৌশলে খুলে ফেলে। তারপর সতর্কতার সঙ্গে প্রবেশ করে সেই ক্যাবিনে।

বনহুর জলদস্যুর বিছানার পাশে এগুতেই নজরে পড়ে দুটো ঝুমুর বিছানার উপরে ছড়িয়ে আছে। হয়তো বা নর্তকীর চরণের নুপুর এ দুটো। এতোক্ষণ নর্তকীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছিলো তারপর নর্তকী বিদায় নিয়েছে। জলদস্যু গভীর নিদ্রায় মগ্ন এখন।

বনহুর নিদ্রিত জলদস্যুর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাত দিয়ে আচম্বিতে চেপে ধরলো জলদস্যুর কণ্ঠনালী। বিছানায় উঠে বসে ভীষণ জোরে চাপ দিলো বনহুর ওর গলায়।

জলদস্যু জেগে উঠবার আগেই তার মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো লাল টক্ টকে রক্ত। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হলো তার গলা দিয়ে।

বনহুর আগেই ক্যাবিনের দরজা আটকে দিয়েছিলো।

সর্দারের ক্যাবিনে গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে ছুটে এলো কয়েকজন অনুচর। ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—ওস্তাদ...ওস্তাদ... কি হয়েছে...ওস্তাদ...

ততক্ষণে বনহুর জলদস্যু সর্দারকে একেবারে ঠান্ডা করে দিয়েছে। একে সে অতিরিক্ত নেশা পান করেছিলো তারপর গভীর ঘুমে অচেতন ছিলো কাজেই দস্যু সর্দার অতি সহজেই পরপারে যাত্রা করলেন। বনহুর নিজের কণ্ঠস্বরকে ঠিক জলদস্যু সর্দারের মত করে নিয়ে জবাব দিলো—তোমরা যাও ঘুমাও গে! আমার নেশাটা একটু বেশি হয়ে গেছে তাই গলাটা কেমন গোঁ গোঁ করছে.....তোমরা চলে যাও আমাকে বিরক্ত করতে এসো না।

আচ্ছা ওস্তাদ আমরা যাচ্ছি।

জলদস্যুগণ ওস্তাদের কথা শুনে চলে গেলো যে যার বিশ্রাম ক্যাবিনে।

বনহুর তাড়াতাড়ি সর্দারের শরীর থেকে তার ড্রেস খুলে নিলো। তারপর পরে নিলো সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। হঠাৎ যদি কেউ এসে পুনরায় ডাকাডাকি শুরু করে সে জন্যই বনহুর দ্রুত হস্তে কাজ করছিলো। নিজের দেহের পোশাকটা খুলে নিয়েছিলো সে আগেই। এবার বনহুর তার পোশাকটা জলদস্যু সর্দারের দেহে কোন রকমে পরিয়ে দিলো। বিছানায় গড়িয়ে পড়া রক্তগুলো দু'হাতে মাখিয়ে জলদস্যুর মুখখানা একেবারে অচেনা করে ফেললো।

বনহুর এবার ক্যাবিনের দরজা খুলে ফেললো।

দরজা খুলবার আগে বনহুর জলদস্যু সর্দারের পোশাক পরে নিজের চেহারাটা একবার আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে নিলো। হাঁ তাকে প্রায় জলদস্যু সর্দারের মতই মনে হচ্ছে। তবে পোশাকটা একটু ঢিলা হচ্ছে তার শরীরে এই যা। একটা ছুরি নিয়ে আঠা দিয়ে আটকে নিলো ঠিক সর্দারের গোঁফ যেমন ছিলো তেমন করে। সর্দারের ক্যাবিনে বিরাট একখানা আয়না ছিলো এবং আয়নার পাশে কতকগুলো কাগজকলম এবং আঠার পট ছিলো যার জন্য বনহুরের ছদ্মবেশ ধারণ তেমন কোন অসুবিধা হয় না।

বনহুর দরজা খুলে হাতে তালি দিলো যেমন করে জলদস্যু সর্দার দিতো।

সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যু অনুচরগণ ছুটে এলো। জাহাজের ডেকে তখন জমাট অন্ধকার। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন বললো—ওস্তাদ কোন জাহাজ দেখা গেছে কি?

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো—না।

তবে কি হুকুম ওস্তাদ?

ওকে খতম করেছি। বন্দীটা আমার ক্যাবিনে প্রবেশ করে আমাকে আক্রমণ করেছিলো। যাও আমার বিছানায় শুয়ে আছে নিয়ে এসে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করো।

এক সঙ্গে সবাই ক্যাবিনে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর বলে—থামো।

ওস্তাদ আপনি বললেন বন্দীকে আপনার বিছানায় হত্যা করে রেখেছেন?

হ্যাঁ রেখেছি। তবে সবাই নয় দু'জন গিয়ে ওর লাশটা তুলে নিয়ে এসো এবং সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করো।

সর্দারের আদেশ অমান্য করার সাহস তাদের ছিলো না। সবাই ক্যাবিনে প্রবেশ না করে দু'জন বলিষ্ঠ জোয়ান ক্যাবিনে প্রবেশ করে তুলে নিয়ে এলো লাশটা।

জাহাজের ডেকে তখন অন্ধকার।

লোক দু'জন যখন লাশটা ধরাধরি করে ডেকে নিয়ে এলো তখন ঠিক মনে হচ্ছিলো এটা সেই লোক। যাকে তারা পাশের ক্যাবিনে আটক করে রেখেছিলো। কারণ অন্ধকারে পোশাকটাই হলো চিহ্নস্বরূপ!

লোক দু'জন নিজেদের সর্দারের শবদেহ নিঃশব্দে সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করে হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

বনহুর বললো—যাও তোমাদের কাজ এখন শেষ হয়েছে। আমি ঘুমাবো বিছানা পাল্টে দিয়ে যাও।

দু'জন অনুচর রক্ত মাখা বিছানাখানা পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়।

সবাই চলে যায়!

বনহুর জলদস্যু সর্দারের বিছানায় শুয়ে পড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুম তার চোখে আসেনা। ভোর হতে না হতেই তাকে জলদস্যু সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তাই সে মনে মনে আওড়াতে থাকে সর্দারের কথার ভাবধারাগুলো।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর!

❑

ক্যাবিনের দরজা খোলাই ছিলো। বনহুর ইচ্ছা করেই বন্ধ করেনি কারণ এতে জলদস্যুগণের মনে কোন সন্দেহ জাগতে পারে।

হঠাৎ নারী কণ্ঠের আহ্বানে ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের। চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পায় একটি নারী তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে হাস্য দীপ্ত কণ্ঠে ডাকছে—ওস্তাদ কত ঘুমাও এবার ওঠো।

বনহুর হাই তুলে পাশ ফিরলো—আর একটু ঘুমাতে দাও। পাশ ফিরে ভাবছে বনহুর ওর নাম সে জানে না। জানেনা ওর সঙ্গে জলদস্যুর কি সম্পর্ক! হঠাৎ কোন কথা বলা উচিৎ হবে না, কাজেই নিশ্চুপ ঘুমের ভান করে রইলো।

নারীটি বললো—আজ কি তোমার ভীমরতি ধরেছে? রোজ কত সকাল সকাল উঠো। আমাকে নিয়ে কত আমোদ আহলাদ করো .....কই আমাকে পাশে টেনে নিলে না তো?

বনহুর বললো—মন ভাল নেই। এখন যাও সত্যি বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

না যাবোনা। একটু পরেই অনুচরদের নিয়ে মেতে উঠবে, আজ কোনদিকে অগ্রসর হবে কি ভাবে কাজ চালাবে। আরও কত কি ও বুঝেছি সূর্যমুখি আসেনি তাই অভিমান করেছো।

বনহুর আলগোছে মনে মনে নামটী মুখস্থ করে নিলো, তাহলে আরও একজন আছে নাম তার সূর্যমুখি। কিন্তু এর নাম কি কে জানে। তবু প্রতিক্ষা করতে লাগলো বনহুর আরও কিছু জানার জন্য।

নারীটি পুনরায় বললো—বুঝেছি সূর্যমুখিকে তুমি বেশি ভালবাসো আমাকে মোটেই ভালবাসোনা। বেশ মণিমালা বিদায় নিচ্ছে.....

বনহুর বুঝলো ওর নাম মণিমালা। মনে মনে উচ্চারণ করলো বনহুর মণিমালা। হঠাৎ একটু অস্পষ্ট ভাবে নামটা ওর কানে পৌঁছে গেলো?

কি আমাকে মনে মনে গাল দিচ্ছো?

এবার বনহুর কথা না বলে পারলোনা, বললো—না না গাল দেবো কেনো মনে মনে তোমাকে স্মরণ করছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে চলে যেতে বললে কেনো। রোজ আমি না এলো তোমার যে মন ভরেনা। আজ তুমি কেমন যেন হয়ে গেছো। কি হয়েছে তোমার বলোনা? মনিমালা পাশে বসে বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো আবার রাতে ঘুম হয়নি বুঝি।

বনহুর অর্দ্ধশায়ীত অবস্থায় উঠে বসে মনিমালার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—হাঁ রাতে মোটেই ঘুম হয় নি মনিমালা কারণ একটা বিভ্রাট ঘটে গেছে।

বিভ্রাট! কি বিভ্রাট সর্দার?

পাশের ক্যাবিনে যে বন্দীটিকে আটকে রাখা হয়েছিলো সে আমার ক্যাবিনে শার্শী গলিয়ে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমিই তাকে হত্যা করেছি.....

লোকটাকে হত্যা করেছো সর্দার।

হাঁ আশ্চর্য ওকে হত্যা করতে গিয়ে আমি একেবারে হীমশীম খেয়ে গিয়েছিলাম।

ওর লাশ কোথায়?

সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করেছি।

যাক ভালই হলো শত্রুকে কোনদিন জিইয়ে রাখতে নেই। সর্দার?

বলো?

সূর্যমুখিকে তুমি বেশি ভালবাস না আমাকে?

এবার হাসলো বনহুর তারপর বললো—তোমাকে।

তবে আজ আমাকে এমন দূরে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো কেনো?

বললাম তো আজ মন ভাল নেই। মনিমালা এখন যাও কেমন?

আচ্ছা যাচ্ছি কিন্তু মনে থাকে যেন সূর্যমুখিকে যদি ডেকে পাঠাও তবে দেখবে মজাটা হাঁ।

না সূর্যমুখিকে নয় তোমাকেই আবার ডাকবো।

আচ্ছা সর্দার?

বলো?

নতুন মেয়েটাকে নিয়েতো কাল খুব ফুর্তি করলে কেমন লাগলো ওকে?

ও কি বললো?

আমার কথা যেন বুঝতেই পারছোনা—সেই বন্দী মেয়েটার কথা বলছি।

মোটেই তোমাদের মত নয়।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

তবে যে ওকে বশ করার জন্য সূর্যমুখিকে অনেক টাকা বখশীস দেবে বলেছো? সূর্যমুখি মেয়েটাকে নানাভাবে বোঝাচ্ছে। সমস্ত রাত ওরা ঘুমায়নি কত কথা বলছে সূর্যমুখি ওকে। কিন্তু মেয়েটা শুধু কাঁদছে কিছুতেই বশ মানছে না। মেয়েটা একেবারে অবুঝ।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ বুঝেছি।

আচ্ছা সর্দার আমি যদি ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তোমার কাছে আনতে পারি আমাকে কি বখশীস দেবে?

একটু ভেবে বললো বনহুর—তোমাকে সে কাজ করতে হবে না।

ও আমাকে তুমি ঠকাতে চাও। আমি ছাড়ছি না, শোন সর্দার, আমি যদি পারি তবে আমাকেই বখশীসটা দিতে হবে কিন্তু..... কথাটা বলে বাঁকা চোখে একবার সে বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ ক্যাবিনের দেয়ালে একটা বড় ফটোতে নজর পড়লো তার। দেখলো ফটোখানার নিচের অংশ কালো কাপড়ে ঢাকা—মাথায় পাগড়ী কতকটা বনহুরের নিজের পাগড়ীর মতই দেখতে। বনহুর চিনতে পারলো এটা জলদস্যু সর্দারের আর এক বেশ। ভালই হলো বনহুর সর্দারের এই বেশটাই বেছে নেবে।

ক্যাবিনের ওদিকে আর একটি ক্যাবিন আছে বলে মনে হলো বনহুরের। সে ঐ ক্যাবিনের দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতেই খুশি হলো কারণ সে দেখলো ঐ ক্যাবিনে নানা রকম পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নানা ধরনের মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে।

বনহুর এক একটা ড্রেস পরে দেখে নিলো। পাগড়ী পরে পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢেকে দেখলো। সবই ভাল তবে পোশাকগুলো একটু ঢিলা হচ্ছে। জলদস্যু সর্দার তার চেয়ে একটু মোটা ছিলো এই যা।

বনহুর ড্রেসগুলো পরীক্ষা করার পর বেরিয়ে এলো তার পূর্বের ক্যাবিনে।

ঐ মুহূর্তে একজন জলদস্যু এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো—সর্দার দূরে একটি জাহাজ দেখা যাচ্ছে চম্বুক মেশিন চালু করে দেবো কি?

যাও আমি আসছি? বনহুর অপর ক্যাবিনে প্রবেশ করে ড্রেস পাল্টে নেয় এবং পাগড়ী পরে পাগড়ীর আঁচল দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢেকে ফেলে তারপর পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসে যেমন সর্দারের ফটোখানায় তার পোশাক পরা রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে।

সর্দার আসতেই জলদস্যুগণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

একজন বললো চম্বুক মেশিনের সুইচ চালু করে দেবো সর্দার।

অপর একজন বললো—দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যাচ্ছে ওটা যাত্রীবাহী জাহাজ নয়, ওটা মালবাহী জাহাজ।

বনহুর বললো—আচ্ছা আগে আমি নিজে দেখে নেই। বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখলো। দেখে বললো, হাঁ ওটা যাত্রীবাহী জাহাজ নয় মালবাহী, কিন্তু ওতে কি মাল আছে আমরা জানিনা তবু আমরা ঐ জাহাজখানাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। যাও চম্বুক মেশিনের সুইচ অন করে দাও।

সর্দারের আদেশ পাওয়া মাত্র চুম্বক মেশিনের সুইচ অন্ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দূরের জাহাজখানা এগিয়ে আসছে বলে মনে হলো।

এদিকে জলদস্যুগণ অস্ত্র শস্ত্র হাতে সবাই ডেকে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখছে।

দূরে বহু দূরে জাহাজখানা সাঁ সাঁ করে এগিয়ে আসছে।

চুম্বক মেশিনের অদ্ভূত শক্তি!

জাহাজখানা অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে নিকটবর্তী হলো।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তখনও চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজখানা একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। বনহুর অবাক হয়ে গেলো জাহাজে কোন লোকজন নড়াচড়া করছে বলে মনে হলোনা। আরও নিকটবর্তী হলে জাহাজখানায় দেখা গেলো জাহাজের ডেকে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তারা যেমন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তেমনি রয়েছে এক চুলও কেউ এদিক ওদিক যাচ্ছে না বা কোন কথা বার্তা বলছেনা।

জলদস্যুগণ বলে উঠলো—ওস্তাদ তাজ্জব ব্যাপার জাহাজে লোকজন সব যেন প্রাণহীন মনে হচ্ছে ব্যাপার কি?

বনহুর নিজেও অবাক হয়ে গেছে, সে বললো—প্রাণহীন বলে মনে হচ্ছে না একেবারে প্রাণহীন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

জাহাজখানা ততক্ষণে একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলদস্যুদের জাহাজখানায় এসে লেগে যাবে।

বনহুর বুঝতে পারলো ঐ জাহাজে নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্য জাহাজের সমস্ত খালাসী বা নাবিকগণ মৃত্যুবরণ করেছে। যে যেখানে যেমন ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কারো দেহে প্রাণ নেই।

বনহুর বুঝতে পারলো এটা কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-এর দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আরও বুঝতে পারলো ঐ জাহাজেই কারেন্ট বা বিদ্যুৎ সংযোগ

রয়েছে। বনহুর বলে উঠে—শীগগীর চম্বুকের সুইচ অফ করে দাও-নইলে এ জাহাজখানা আমাদের জাহাজের গায়ে সংলগ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই মৃত্যুবরণ করবো।

ওস্তাদের আদেশ পাওয়া মাত্র জলদস্যুগণ চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ করে দিলো। অমনি মালবাহী জাহাজখানা যেন হোচট খেয়ে থেমে গেলো। হঠাৎ ধাক্কা খেঁয়ে থেমে যাওয়ায় মালবাহী লৌহ জাহাজ ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলো।

বনহুর বললো—এই মুহূর্তে তোমরা এক ভীষণ মৃত্যু থেকে রেহাই পেলে।

জলদস্যুগণ ঘিরে দাঁড়ালো ওস্তাদকে।

বনহুর বলে চলেছে—জানো এ জাহাজখানাতে এক ভয়ঙ্কর জিনিস সংযোগ হয়ে গিয়েছিলো যার জন্য এ জাহাজের সবগুলো খালাসি এবং নাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। জিনিসটা হলো বৈদ্যুতিক কারেন্ট। এ কারেন্ট দ্বারা সমস্ত জাহাজে এক মারাত্মক অবস্থা ধারণ করেছিলো ভাগ্যিস এ জাহাজখানা আমাদের জাহাজের সঙ্গে সংলগ্ন হয়নি। হলে আমরা কেউ রক্ষা পেতাম না।

জলদস্যুগণ ওস্তাদকে ধন্যবাদ জানালো।

জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই আনন্দধ্বনি করতে লাগলো। জলদস্যুদের একজন বললো—ওস্তাদ চলুন ফূর্তি করা যাক।

সর্দারের সঙ্গে অনুচরদের আচরণের পদ্ধতি লক্ষ্য করে মনে মনে হাসলো বনহুর। সে নিজেও দস্যু সর্দার অথচ তার অনুচরগণ তার সঙ্গে এত সমীহ এবং সংযতভাবে কথা বার্তা বলে। কারো সাধ্য নেই কোন সময় তার সম্মুখে কোন রুচীহীন অশ্লীলতাপূর্ণ কার্যকলাপ করে।

জলদস্যু সর্দারের অনুচরগণ সর্দারকে নিয়েই ফুর্তি করবে বলে অগ্রসর হলো।

বিরাট জাহাজের মাঝখানে যে ক্যাবিনটা সবচেয়ে বড় সেই ক্যাবিনে এসে জড়ো হলো সবাই। কোরা, মাধা ও রামা এরা তিনজন সর্দারের মতই বলিষ্ঠ জোয়ান এবং শক্তিমান। এদের তিন জনের চেহারাও এক একটা ভয়ঙ্কর জানোয়ারের মত।

এরা তিনজন সর্দারের পাশে ঘিরে বসলো।

সম্মুখে টেবিলে অনেকগুলো বোতল আর অনেকগুলো গেলাস।

সর্দারসহ জলদস্যুরা এসে বসতেই একটি নর্তকী এসে দাঁড়ালো। বয়স চব্বিশ কিংবা পঁচিশ হবে। পরনে ঘাগড়া, মাথার চুল বিনুনী করা। বেনুনীতে জরির ফিতা জড়ানো। গায়ে জামা এবং একটি ফিনফিনে পাতলা ওড়না। যার মধ্য দিয়ে ওর সমস্ত দেহটা দেখা যাচ্ছে। চোখে কাজল, ঠোঁটে এবং গালে আলতা মাখানো।

অভিনব ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ালো নর্তকীটা সর্দারের সম্মুখে। দু'চোখে বিশ্রী লালসাপূর্ণ চাহনী। সেলাম জানালো যে সবাইকে নাচের ভঙ্গীমায়।

সবাই ওকে বাহবা দিয়ে হাস্যধ্বনি করে অভিনন্দন জানালো।

বনহুর ভাবছে কে এই নর্তকী? সকালে যে তার শয্যায় গিয়ে তার দেহের উপর ঢলে পড়ছিলো একি সেই মনিমালা? না সে নয়—তবে কি এরই নাম সূর্যমুখি? না যে রাতে নাচ দেখালো সর্দারকে সেই এই সুরমা? কে এই নারী, কে জানে।

জলদস্যু সর্দারের বেশে বনহুরকে অভিনয় করতে হবে। এদের ঘাটি বা আস্তানার সন্ধান নিতে হবে তাকে। বনহুরকে তাহলে আজ সত্যি সত্যি মদ খেতে হবে কিন্তু কি করে তা সম্ভব।

ততক্ষণে নর্তকী গেলাসে মদ পূর্ণ করে এগিয়ে ধরেছে সর্দারের সামনে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে নর্তকীর হাত থেকে কাঁচ পাত্রটা হাতে নেয়।

ওদিকে জলদস্যুগণ সবাই এক একটা গেলাস হাতে তুলে নিয়ে বোতল থেকে মদ ঢেলে গলধঃকরণ করতে লেগে গেছে।

বনহুর কণ্ঠস্বর জলদস্যু সর্দারের অনুকরণে বললো—এবার নাচ দেখাও সুন্দরী!

নর্তকী খিল খিল করে হেসে উঠলো—বাঃ নতুন নাম দিলে?সুরমা বলে ডাকবে না?

বললো বনহুর—তুমি কি সুন্দরী কম? নাচো এবার সুরমা। বনহুর বুঝতে পারলো এর নামই সুরমা।

সুরমা ততক্ষণে নূপুরধ্বনি তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। হেসে দুলে, বিনুনী দুলিয়ে, মাজা ঘুরিয়ে নানা ভঙ্গীমায় নাচছে।

জলদস্যুদের মধ্যে বিপুল আনন্দ ধ্বনি জাগে।

কেউ বা শিস দেয়।

কেউ বা কাঁচ পাত্র হাতে সুরমার সঙ্গে নাচতে শুরু করে। কেউ বা জাহাজের মেঝেতে বসে হামাগুড়ি দেয়।

বনহুর সেই ফাঁকে নিজের হাতের কাঁচ পাত্র থেকে মদগুলো ঢেলে দেয় মেঝেতে। টেবিলের আড়াল থাকায় কেউ তা লক্ষ্য করেনা। বনহুরের মুখে কালো কাপড় বাঁধা রয়েছে সে খালি গেলাসটা কাপড়ের নিচে নিয়ে মুখে ধরে যেন সে মদপান করছে।

নাচ গান আর জলদস্যুদের জড়িত কণ্ঠস্বরে সমস্ত জাহাজ মেতে উঠে।

নর্তকী সুরমা যখন নাচছিলো তখন জলদস্যুরা কেউ বা ওর আঁচল ধরে টানছে কেউ বা ঘাগড়া ধরে। কেউ বা বিনুনী ধরে।

সুরমা নাচ শেষ করে অকস্মাৎ দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের গলা— সর্দার।

বনহুর মুহূর্তে সংযত হয়ে সোজা ভাবে উঠে দাঁড়ালো। নর্তকীর হাত দু'খানা আপনা আপনি খসে এলো ওর গলা থেকে। কারণ বনহুর দীর্ঘদেহী নর্তকী ছিলো বেটে মত কাজেই বনহুরের কণ্ঠ তার নাগালের বাইরে।

সুরমা অভিমানে মুখ ভার করে বললো—বখশীস দিলে না?

বখশীস ধরা রইলো তোমার জন্য।

বনহুর কথাট বলে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। অত্যাধিক সারাব পানের পর মানুষের অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমনি করে।

সুরমা কিছুটা অবাক হয়।

কোরা সুরমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—দুঃখ করিস না সুরমা সর্দারের মন ভাল নেই তাই তোকে রেখে চলে গেলো।

সুরমা অবাক হয়ে বলে—কেনো সর্দারের মন ভাল নেই? কেনো?

ও তোরা বুঝবিনা। মেয়ে মানুষ তোরা শুধু নাচতে আর গাইতে জানিস আর জানিস...

কোরা যাতা বলবিনা। সর্দার আজ যেন কেমন হয়ে গেছে।

হবে না আজ জাহাজ সহ সবাই মরতাম। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছিস।

তার মানে?

মানে সবাই মরতাম...

সে কেমন রে কোরা?

কোরা বেশি মদ পান করেছিলো তাই বার বার সে ঢেকুর তুলছিলো বললো—বল না রাঘা সব খুলে বল সুরমার কাছে।

এ্যাঁ আমি বলবো?

হাঁ বল।

এসো সুরমা আমার কাছে এসো।

সুরমা এসে বসে রাঘার কাছে।

রাঘাও ঢেকুর তুলছিলো তবু বলতে শুরু করলো—একটা বড় মিস হয়ে গেলো। এক জাহাজ মাল হাত ছাড়া হয়েছে আমাদের। সর্দারের মন তাই ভাল না।

সুরমা বলে উঠে—তবে যে কোরা বললো—বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছি আমরা।

এতোক্ষণ মাধা গেলাসের পর গেলাস ঢক ঢক করে খাচ্ছিলো সে গেলাস রেখে উঠে দাঁড়ালো, বললো শোন সুরমা আমি বলছি।

বলো কি করে আমরা জীবনে বেঁচে গেলাম?

সে এক ভীষণ ব্যাপার।

ভূমিকা রেখে বলো!

দূরে একটা জাহাজ দেখে আমরা সর্দারকে সংবাদ দিলাম। সর্দার তো শুনে ছুটে এলো। চুম্বক মেশিন চালু করতেই জাহাজখানা তীর বেগে আমাদের জাহাজের দিকে আসতে লাগলো। আমরা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সবাই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সর্দার চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখছিলো। জাহাজখানা যে মালবাহী এটা আমরা অল্পক্ষণেই বুঝতে পেরেছিলাম।

তারপর?

জাহাজখানা আরও এগিয়ে এলো। সর্দার বললো, ঐ জাহাজে একটি মানুষকে নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা বড় রহস্যজনক বলে মনে হলো।

সুরমা বলে উঠলো—ঠিক বলেছো মাধা—জাহাজের কোন মানুষকে নড়াচড়া করতে না দেখাটা বড় রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। বলো তারপর?

জাহাজখানা আরও নিকটে এসে গেছে। তখনও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখছিলো। সে বলে উঠলো—জাহাজে লোক দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একটুও নড়ছেনা। ব্যাপার কি?

সুরমা দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে শুনছিলো।

মাধা বলে চলেছে।

তখন অন্যান্য জলদস্যুগণ যে যা মুখে আসছে আবোল তাবোল বলা কওয়া করছে। কেউ নাচছে কেউ গান ধরেছে, সবাই নেশাতে চুর চুর।

মাধাও নেশায় টলছে, কথাগুলোও সব এলোমেলোভাবে বলছে —জাহাজখানা এসে গেলো। এই আমাদের জাহাজের গায়ে লেগে যাবে আর কি ঠিক ঐ মুহূর্তে সর্দার তাড়াতাড়ি চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ করে দিতে বললো। আমরা সর্দারের কথা মত কাজ করলাম। জানো সুরমা চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ করার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসা জাহাজখানা হোচট খেয়ে যেন থেমে গেলো অমনি এক ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে সাগরবক্ষে তলিয়ে গেলো সেই মালবাহী জাহাজখানা...

এতে আর সর্দারের মন খারাপ হবার কথা কি?

আগে সব শোন তারপর বলো। জানো সুরমা ঐ জাহাজে কি ছিলো আর কেনোই বা ও জাহাজের সব লোকজন অমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো?

তা কেমন করে জানবো?

কারেন্ট। বিদ্যুৎ কারেন্ট দ্বারা সমস্ত জাহাজাখানা মারাত্মকভাবে সংযোগ হয়েছিলো এবং সে কারণেই ও জাহাজের সব খালাসী আর নাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলো।

সত্যি!

হাঁ, জাহাজখানা যদি আমাদের জাহাজের গায়ে এসে লাগতো তা হলে আমাদের অবস্থায়ও ঠিক ঐ জাহাজের নাবিক আর খালাসীদের মত হতো বুঝলে? তাই ওস্তাদের মনটা বড় ভাল নেই আজ মনে হচ্ছে।

মরণের মুখ থেকে বাঁচলাম আমরা এটা তো আরও বেশি আনন্দের কথা। ওস্তাদ আনন্দ না করে বিদায় নিয়ে গেলো।

ও যেতে দাও সুরমা? আমরা তো রয়েছি একটা নাচ দেখাও.....

আর একজন বলে উঠে—একটা নয় দু'টো...আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সে।

অপর একজন বলে—না তিনটে নাচ দেখাতে হবে না হলে আমরা সুরমাকে নিয়ে চোখে পরবো।

সুরমাকে নিয়ে যখন জলদস্যুগণ নানারকম কথাবার্তা বলছে ঠিক তখন পাশের ক্যাবিনে কয়েকজন জলদস্যু নতুন মেয়েটা সম্বন্ধে বলা কওয়া করছে।

একজন বলছে—ওকে নিয়ে ওস্তাদ শুধু ফুর্তি করবে আর আমরা ফাঁকি যাবো। তা হবেনা আমরাও ওকে চাই?

আর একজন বললো—সাবধান ওস্তাদ যদি জানতে পারে তুই এ কথা বলেছিস তা হলে গর্দান যাবে বুঝলি?

কেনো ওকে তো আমরাই লুট করে এনেছি। তা শুধু শুধু ওস্তাদের জন্য নাকি?

তবে কি?

তুই যা বলিস মেয়েটাকে আমার খুব পছন্দ।

আস্তে বল, আস্তে বল ওস্তাদ শুনে ফেলবে। এখন বল ওকে ওস্তাদের ক্যাবিনে দিয়ে আসি।

আর আমরা?

আমরা সুরমার নাচ দেখিগে চল। সুরমাই আমাদের ভাল বুঝলি?

চল তবে ওকে ওস্তাদের ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি?

চল।

বেরিয়ে যায় দু'জন অনুচর।

❑

বনহুর ক্যাবিনে পায়চারী করছিলো।

ক্যাবিনের দরজা ভেতর থেকে আটকানো। বনহুর বলে দিয়েছে আমাকে তোমরা সব সময় বিরক্ত করবে না। যখন প্রয়োজন হবে আমি তোমাদের ডেকে নেবো।

বনহুর অনুচরদের আনন্দ উৎসব থেকে সরে এসে ক্যাবিনে পায়চারী করছিলো আর ভাবছিলো আগামীতে তাকে কি কাজ করতে হবে, কিভাবে এদের জলদস্যুতা থেকে অন্য কাজে নিয়োজিত করবে। এদের সর্দারকে ধ্বংস করেছে—সবচেয়ে কঠিন যে কাজ তার সমাধা হয়েছে...কিন্তু কয়েকজন জলদস্যু আছে যারা সর্দারের চেয়ে কম নয়। এদের শায়েস্তা না করলে উপায় নাই। .....

হঠাৎ দরজায় আঘাত করে ডাকে, ওস্তাদ—ওস্তাদ—দরজা খুলুন।

বনহুর নিজের মুখের আবরনী টেনে দেয় তারপর ক্যাবিনের দরজা খুলে ফেলে। দরজা খুলতেই বিস্মিত হয় দু'জন অনুচর সেই তরুণীটিকে জোর পূর্বক ধরে এনেছে তার ক্যাবিনে। মেয়েটি আলু থালু বেশ, চোখে মুখে ভয় বিহ্বল ভাব। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

বনহুর দরজা খুলতেই জলদস্যু অনুচরদ্বয় মেয়েটিকে জোরপূর্বক টেনে হিচড়ে ক্যাবিনের মধ্যে এনে ঠেলে দেয় তারপর বেরিয়ে যায় ওরা।

মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠে—না না আমাকে তোমরা এখানে রেখে যেওনা...আমাকে তোমরা নিয়ে যাও বন্দী করে রাখো তবু এখানে রেখে যেওনা.....

মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

অনুচরদ্বয় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকায় তরুণীটির দিকে। একজন পুনরায় ওকে ঠেলে দিতে যাচ্ছিলো অমনি বনহুর তরুণীর হাতখানা ধরে ফেলে অনুচরদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে—তোমরা যাও।

ওরা চলে যায়।

তরুণী ভয়ার্তভাবে চিৎকার করে উঠে—শয়তান আমাকে তুমি মেরে ফেলো। আমাকে তুমি মেরে ফেলো.....

বনহুরের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় তরুণী কিন্তু এক চুল সে নড়তে পারে না। বনহুর ক্যাবিনের দরজা আটকে দেয়।

তরুণী এবার বনহুরের হাত থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত ক্যাবিনের এক পাশে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। এলোমেলো চুল, পরিধেয় বসন ভুলুণ্ঠিত। জামাটার স্থানে স্থানে ছিড়ে তরুণীর শুভ্র দেহের

মাংস পেশীগুলো নজরে পড়ছে। বনহুরের দিকে তাকিয়ে আছে সে কাতর করুণ অসহায় চোখে। হিংস্র ব্যাঘ্রের মুখে মেষ শাবকের যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি।

বনহুর ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে কয়েক পা এগুলো মাত্র তারপর সে একটা সোফায় বসে পড়ে মুখের আবরণ খুলে ফেললো।

চমকে উঠলো তরুণী এতো সে মুখ নয়। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর নরপশু মুখ তো এমন ছিলো না। এ তা হলে কে? তবে কি সে নয়? তরুণীর দু'চোখে বিস্ময়।

বনহুর বলে—ভয় নেই আমি আপনাকে স্পর্শ করবো না। আপনি এসে বসুন.....

ধীরে ধীরে তরুণীর মুখমন্ডল থেকে ভীত আতঙ্কিত ভাব মুছে যায় সে যে ভাবে জড়ো সড়ো হয়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলো এবার তরুণী সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বনহুর ততক্ষণে নিজের মুখ থেকে বৃহৎ আকার গোঁফ জোড়া খুলে ফেলে। যে গোঁফ জোড়া সে তৈরী করেছিলো জলদস্যু সর্দারের মাথার চুল দিয়ে। কিছুটা চুল দিয়ে বনহুর নিজের ভ্রু জোড়াও তৈরি করে নিয়েছিলো। ভ্রু এবং গোঁফ জোড়া খুলতেই বনহুরের নিজস্ব চেহারা ফুটে উঠলো।

তরুণীর চোখে মুখে আশ্চর্যভাব ফুটে উঠেছে। গতরাতে যে নরপশু তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিলো এ সে নয়। তবে একে সে দেখেছিলো হাত পিছ মোড়া করে বাধা অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য। তরুণী মুহূর্তে বুঝে নেয় এ সেই ব্যক্তি যার আগমনে শয়তানটা ক্ষণিকের জন্য তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলো।

তরুণীকে ভাবতে দেখে বলে বনহুর—হয়তো সব বুঝতে পেরেছেন? আপনি যে জাহাজের যাত্রী ঠিক আমিও সেই জাহাজের যাত্রী । আপনি যেমন বন্দী আমিও তাই ছিলাম তবে কৌশলে জলদস্যুকে হত্যা করে আমি সেই স্থানে মানে অভিনয় করছি বলতে পারেন। আসুন কোন ভয়ের কারণ নেই।

তরুণী অসংযত কাপড় ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে।

বনহুর বলে—বসুন এই আসনটায়।

তরুণী যন্ত্রচালিতের মত আসন গ্রহণ করে।

বনহুর একটা সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করে একমুখ ধোয়া ছেড়ে বলে—কিছু ভাববেন না। এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্ত কারণ আমার কাছে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তরুণী দু'হাতে মুখে ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কাঁদতে কাঁদতে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আমার সব গেছে কি হবে আমার এ জীবন দিয়ে.....আমি আত্মহত্যা করবো.....

আপনি মিছামিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। যা গেছে তাতো আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। কেন আপনি আত্মহত্যা করতে চান? আপনার সম্মুখে এখন আগামী দিনগুলো পড়ে আছে। জীবনের প্রথম ধাপে সবে মাত্র পা রেখেছেন।

বনহুরের কথাগুলো তরুণীর হৃদয় স্পর্শ করে। এমন পৌরুষ দীপ্ত কণ্ঠস্বর সে ইতিপূর্বে কমই শুনেছে! এমন সৌম্য সুন্দর পুরুষ তার দৃষ্টিতে আজও পড়েছে কিনা সন্দেহ। নিস্পলক চোখে তরুণী বনহুরের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনছিলো। বনহুর বলে চলেছে যতদিন এ জাহাজে আমরা আছি ততদিন একটা কাজ আপনাকে করতে হবে বলুন করবেন। হাঁ, তার পূর্বে বলুন আপনার নাম কি।

তরুণী আঁচলে চোখ মুছে নাম বলতে গিয়ে পুনরায় কেঁদে উঠে সে।

বনহুর বলে—থাক তাহলে নাম শুনে কাজ নেই।

না আমি বলছি আমার নাম হুসনা। আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকবেন।

যদি কিছু মনে না করেন আরও কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো।

আচ্ছা করুন?

তরুণী বনহুরের কাছে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে তবে লজ্জায় মাথাটা সে নত করে কথা বার্তা বলছিলো।

বনহুর বলে—এ জাহাজে থাকতে হলে আপনাকে প্রতিদিন আমার ক্যাবিনে আসতে হবে। অবশ্য জলদস্যুরা আপনাকে জোরপূর্বক নিয়ে আসবে আপনি ভয় পাবেন না কারণ আমি পূর্বেই বলেছি আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবেনা। বুঝেতে পারছেন কেনো আমি বললাম।

হাঁ পেরেছি আমাকে রক্ষা করার জন্যই আপনি এক কাজ করবেন।

নিশ্চয়ই।

জানিনা আপনি কে। হয়তো খোদা আমাকে রক্ষা...কিছু বলতে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে আবার হুসনা কেঁদে উঠলো—জীবন রক্ষা পেয়ে আর কি লাভ হবে আমার আমি যে অপবিত্রা.....

ছিঃ ছিঃ আপনি মিছিমিছি মনকষ্ট পাচ্ছেন। যা ঘটেছে তাতো আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। কেনো এ সব চিন্তা করে আপনি মুষড়ে পড়ছেন?

আপনি তো জানেন মেয়েদের সতীত্ব পরম ধন যা একবার হারালে আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যায়না।

বনহুর এবার সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করে চলে। এ জাহাজে বনহুর সর্দারের ক্যাবিনে প্রচুর সিগারেট পেয়েছিলো শুধু সিগারেট নয় চুরুট, মূল্যবান তামার্ক, গাঁজা, মদ, আরও অনেক কিছু। কিন্তু এতোসবে প্রয়োজন ছিলোনা বনহুরের তার প্রয়োজন শুধু মূল্যবান সিগারেটের।

কিছুক্ষণ এক মনে সিগারেট পান করে সোজা হয়ে বসলো তারপর বললো—আপনি এবং আমি একই জাহাজ ঈগলের যাত্রী আমাদের যখন উভয়ের একই অবস্থা তখন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে উভয়কে জানা দরকার। আচ্ছা বলুন আপনার সঙ্গে কে ছিলেন এবং আপনার গন্তব্যস্থান কোথায় ছিলো?

হুসনা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে তারপর দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো—আমি জিহাংহায় পড়াশোনা করতাম। ডিগ্রি শেষ করে ফিরে যাচ্ছি কান্দাই।

কান্দাই?

হাঁ আমার বাবা কান্দাই চাকরী করেন।

কি নাম তাঁর?

আমাব বাবা মিঃ ফারুক আহসান।

একরাশ সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তরুণীর মুখে, বলে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ ফারুক আহসানের কন্যা আপনি?

হাঁ, কিন্তু আপনি আমার বাবাকে চিনলেন কি করে?

এতো বড় নামকরা ডিটেকটিভ তাঁকে চিনবো না বলেন কি মিস হুসনা! তবে একটি কথা জিজ্ঞেসা করি আপনি প্লেনে না গিয়ে জাহাজে যাচ্ছিলেন কেনো, জানতে পারি কি? নিশ্চয়ই সখ করে।

হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন প্রতিবার প্লেনে যাই এবার জাহাজে...

বুঝেছি সাগর ভ্রমণের সখ দমন করতে পারেন নি—যেমন আমি পারিনি। আচ্ছা মিস হুসনা?

বলুন।

কান্দাই থেকে জিহাংহা শুধু হাজার হাজার মাইল দূরেই নয়। জিহাংহা এক অজানা দেশ বলা যায়। আপনি পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে না গিয়ে এসেছিলেন জিহাংহায় কিছুটা আশ্চর্য বটে।

সবাইতো বিদেশ গিয়ে পড়াশোনা করে, আমার ইচ্ছা ছিল অজানা কোন দেশে যাবো যেদেশে কেউ যায় নি এমন দেশে।

আপনার ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়েছিলো বা হয়েছে?

হাঁ আমি ডিগ্রি শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সব বাসনা আমার ধূলিস্মাৎ হয়ে গেলো। কি হবে আমার এ জীবন রেখে...

আবার আপনি অবুঝ হচ্ছেন। কথাটা অন্যদিকে মোড় ফেরাবার জন্য বনহুর বললো—মিস হুসনা আমার গন্তব্যস্থানও কান্দাই। যদি সম্মুখ বিপদগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে আমরা উভয়েই কান্দাই পৌঁছতে সক্ষম হবো বলে আশা করি। আচ্ছা মিস হুসনা আপনার বাবা মিঃ ফারুক আহসান এখন কান্দাই কেনো অবস্থান করছেন জানেন কি?

হাঁ জানি, বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য তিনি অবস্থান করছেন।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বনহুর।

বিস্ময় নিয়ে তাকায় হুসনা বনহুরের মুখের দিকে। এমন করে সে কোনদিন কাউকে হাসতে দেখেনি, অদ্ভুত সে হাসি।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে—মিস হুসনা।

বলুন?

দস্যু বনহুরকে আপনি দেখেছেন?

দু'চোখ গোলাকার করে বলে হুসনা—দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আপনি জানেন না তাই এ কথা বলছেন। সে অতি ভয়ঙ্কর জিনিস।

রাক্ষসের মত ভয়ঙ্কর না হিংস্র জন্তুর মত?

জানিনা, তবে কান্দ্রাইবাসীরা জানে সে এক আতঙ্ক। ভয়ে কেউ কোন সময়ও নাম মুখে আনে না। গভীর রাতে সে জমকালো অশ্বে চেপে আসে, হানা দিয়ে সে হত্যা করে গৃহস্বামীকে, লুটতরাজ করে নিয়ে যায় সব কিছু।

তাই নাকি।

হাঁ আপনি কান্দাই থাকেন অথচ দস্যু বনহুরের নাম শোনেন নি?

বহুদিন দেশ ছাড়া তাই শুনিনি।

সংবাদপত্রে দেখেননি দস্যু বনহুরের কার্যকলাপ—কত কথা বের হয়?

তা দেখেছি কিন্তু ও সব বিশ্বাস হয় নি আমার।

আশ্চর্য মানুষ আপনি!

কি রকম?

দস্যু বনহুর বিশ্ব বিখ্যাত দস্যু, তাকে আপনি বিশ্বাস করেন না।

কোন সময় তার সান্নিধ্য পাইনি কিনা তাই হয়তো...

ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা পড়ে—ওস্তাদ খাবার এনেছি।

বনহুর তাড়াতাড়ি ভ্রু জোড়া এবং গোঁফ আটা দিয়ে আটকিয়ে নেয় তারপর দরজা খুলে দেয় সে।

দু'জন অনুচর একটা বড় রেকাবীতে মাংস রুটী মাখন ডিম আর দু'বোতল মদ নিয়ে হাজির হলো। মাথা নিচু করে কুর্ণিশ জানিয়ে ক্যাবিনের টেবিলে রেকাবীসহ জিনিসগুলো রেখে বেরিয়ে গেলো।

অনুচরদ্বয় খাবার রেখে যেতেই বনহুর কিছু তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো হুসনার দিকে—নিন আগে খেয়ে নিন।

বনহুর হুসনার হাতে খাবার তুলে দিয়ে নিজেও শুরু করে।

হুসনার ক্ষুধা পেরেছিলো সেও খেতে লাগলো। না খেয়ে তো কোন উপায় নেই।

বনহুর খাওয়া শেষ করে একটু হেসে বললো—এবার এগুলোর ব্যবস্থা করতে হয়। মদের বোতলটা হাতে তুলে নেয় সে।

হুসনা দু'চোখে বিস্ময়ে নিয়ে তাকায়, বলে সে—আপনি মদ খান?

না খেলেও এর একটা সৎগতি করতে হবে তো। বোতল হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় তারপর গেলাসে ঢেলে নিয়ে ফেলে দেয় ক্যাবিনের জানালা দিয়ে বাইরে।

খালি বোতলটা রেখে দেয় রেকাবীর উপর। অবশ্য গেলাসে কিছুটা লেগে থাকে, গেলাস দেখে যেন ওরা মনে করে বোতলের সমস্ত মদ ওস্তাদ পান করেছে।

বনহুর বলে—মিস হুসনা এবার আপনি যেতে পারেন অবশ্য আপনাকে অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন ভাব দেখাতে হবে যেন আপনি নির্যাতীতা।

হুসনার দু'চোখ ছল ছল করে উঠে। কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বলে—সত্যি আপনি কত মহৎ, কত মহান...

ঐ সময় দু'জন অনুচর পুনরায় আঘাত করে। ওরা খাবারের শূন্য পাত্র নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। ক্যাবিনে প্রবেশ করলে বলে বনহুর —একে নিয়ে যাও।

হুসনাকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে যায়।

যাবার সময় বলে দেয় বনহুর—ওকে ভালভাবে রেখো যেনো কোন অযত্ন না হয়।

আচ্ছা ওস্তাদ। যেতে যেতে বলে ওরা।

বনহুর সবেমাত্র শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছে ঠিক ঐ মুহূর্তে কয়েকজন অনুচর ছুটে আসে, ওস্তাদ একটা যাত্রীবাহী জাহাজ দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আসুন...

যাও আমি আসছি। বললো বনহুর।

অনুচরদের একজন বলে উঠলো—ওস্তাদ জাহাজখানায় প্রচুর ধন সম্পদ আছে বলে মনে হচ্ছে। চুম্বক মেশিন কি চালু করে দেবো?

না আমি নিজে আগে দেখবো তারপর কি করতে হবে বলবো। বনহুর উঠে বেরিয়ে এলো জাহাজের ডেকে।

চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখতে লাগলো, দূরে একটি যাত্রীবাহী জাহাজ দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখছে বনহুর ঐ সময়, তার চার পাশে জলদস্যুগণ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ওস্তাদের আদেশের প্রতিক্ষা মাত্র।

ওস্তাদের বিলম্বে অনুচরদের অস্থিরতা বেড়ে উঠে তারা বলে—ওস্তাদ বলুন চুম্বক মেশিন চালু করবো।

বনহুর আদেশ না দিয়ে পারে না, বললো—হাঁ এবার চালু করে দাও।

অনুচরগণ হর্ষধ্বনি করে উঠলো।

দু'জন গিয়ে চুম্বক মেশিন চালু করে দিলো।

বনহুর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে আছে দূরে বহু দূরে জাহাজখানার দিকে। জাহাজখানা এগুচ্ছে বলে মনে না হলেও অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো জাহাজখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে।

অদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন এই চুম্বক মেশিন যার শক্তি শত শত মাইল দুরেও কাজ করে। যে কোন জাহাজকে এই চুম্বক মেশিন বা চুম্বক যন্ত্র আকর্ষণ করে টেনে আনে। জলদস্যুদের দস্যুতার এ এক চরম কৌশল। চুম্বক মেশিন দ্বারা এরা হাজার হাজার মানুষের সর্বনাশ করে।

জাহাজের যাত্রীগণ হয়তো নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ ক্যাবিনে বিশ্রাম করছে কিংবা গল্পসল্পে মেতে আছে। অথবা আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছে এমন সময় জাহাজখানা আচম্বিতে এসে সংযোগ হয় জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে। অকস্মাৎ ঝাপিয়ে পড়ে জলদস্যুগণ যাত্রীবাহী জাহাজে এবং চলে হত্যালীলা আর লুটতরাজ।

যদিও বনহুর নিজেও একজন দস্যু তবু তার মনে ব্যথা জাগে কারণ অহেতুক নরহত্যা তার পেশা বা নেশা নয়। লুটতরাজ করাও তার পেশা নয়। তবু কোন কাজই সে অন্যায়ভাবে করে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তার সংগ্রাম।

বনহুরের চিন্তাধারা দ্রুত কাজ করছিলো আর ঘন্টা খানেকের মধ্যেই জাহাজখানা এসে পড়বে তাদের জাহাজখানার পাশে। এ জাহাজ থেকে মহা উল্লাসে ঝাপিয়ে পড়বে জলদস্যুগণ ঐ জাহাজে হত্যা এবং লুণ্ঠন চালাবে ইচ্ছা মত।

কিন্তু বেশি ভাববার সময় নেই ততক্ষণ যাত্রীবাহী জাহাজখানা একেবারে নিকটে এসে গেছে। মাত্র কয়েক মিনিট, জাহাখানা দেখতে দেখতে এসে সংযোগ হলো জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে।

পরক্ষণেই মহা আনন্দে জলদস্যুগণ লাফিয়ে পড়লো যাত্রীবাহী জাহাজ খানায়। বনহুর চিৎকার করে বলছিলো—খবরদার তোমরা কাউকে হত্যা করবে না বন্দী করে এ জাহাজে আনবে না। মূল্যবান যা পাও নিয়ে আসবে অ-প্রয়োজনীয় জিনিস এনে অহেতুক জাহাজে ভার বোঝাই করো না।

সর্দারের কথাগুলো তাদের কাছে নতুন শোনালেও এ নিয়ে কেউ ভাববার সময় পেলো না। তারা যাত্রীবাহী জাহাজে ঝাপিয়ে পড়ে লুটতরাজ শুরু করে দিলো। তবে সর্দারের নির্দেশে কেউ হত্যা বা খুন জখম কাউকে করলো না।

অল্পক্ষণেই এরা যাত্রীবাহী জাহাজখানাকে তচনচ করে ফিরে এলো।

বনহুর সব কিছু লক্ষ্য করলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

সবাই ফিরে এসে চুম্বক মেশিনের সুইচ অফ্ করে জলদস্যু জাহাজ থেকে।

জলদস্যুগণ বললো—ওস্তাদ জাহাজ ছাড়বো?

হাঁ এবার ছাড়ো।

জাহাজ চলতে শুরু করলো।

জলদস্যুগণ আবার আনন্দে মেতে উঠলো।

দু'দিন ধরে চললো আনন্দ ফুর্তি আর নাচ গান। ওরা ওস্তাদকে নিয়েই ফুর্তিতে মেতে উঠলো। সুরমা বাঈ নাচ দেখাতে লাগলো।

মনিমালা আর সূর্যমুখি খুব করে সেজেছে। সর্দারকে ওরা গান শোনাবে।

সূর্যমুখি গান গাইতে শুরু করলো।

মুনিমালা তখন অভিমানে মুখ ভার করে রইলো। বনহুর বুঝতে পারলো মনিমালা রাগ করছে তাই ওর চিবুকে একটু নাড়া দিয়ে বললো রাগ করোনা মনিমালা সূর্যমুখির গান শেষ হলেই তোমার গান শুনবো।

মনিমালা ওর কথায় খুশি হলো। বনহুরের চোখে চোখ রেখে একটু মুচকি হাসলো সে!

সূর্যমুখির গান শেষ হতেই জলদস্যুগণ মহা উল্লাসে তাকে পুনরায় গান গাইবার জন্য বললো কিন্তু বনহুর বললো—না, এবার মনিমালা গান গাইবে।

মনিমালা খুশি হয়ে গাইতে শুরু করলো।

যদিও বনহুরের অসহ্য লাগছিলো তবু সে জলদস্যুদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আনন্দ করতে লাগলো। সূর্যমুখি কাঁচ পাত্র ভরে ভরে হাতে দিচ্ছিলো সর্দারের। ওরা সবাই সর্দারকে খুশি করার জন্য ব্যস্ত।

বনহুর কৌশলে কাঁচ পাত্র থেকে সারাবগুলো ঢেলে দিচ্ছিলো।

এক সময় আনন্দ উল্লাসের বেগ শিথিল হয়ে এলো।

জলদস্যুগণ অত্যন্ত সারাব পান করে যে যেখানে পারলো ঢলে পড়লো।

কয়েকজন গান শুরু করে দিলো।

কোরা আর মাধা এসে বললো ওস্তাদ নুতন মেয়েটাকে আপনার ক্যাবিনে পৌঁছে দেবো।

বনহুর বললো—না থাক। যখন প্রয়োজন ডেকে নেবো। হাঁ শোন তোমরা কেউ যেন ওকে বিরক্ত করোনা।

একজন হেসে বললো—সর্দারের নেক নজর পড়েছে বেচারী একটু জিরিয়ে নিক।

রাত বাড়ছে।

বনহুর ফিরে আসে নিজের ক্যাবিনে।

এসে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে সবেমাত্র দেহ থেকে জলদস্যু সর্দারের ড্রেস খুলতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ মুহূর্তে দরজায় ধাক্কা পড়ে।

বনহুর ড্রেস পরিবর্তন না করেই ক্যাবিনের দরজা খুলে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে সাপ দেখার মত চমকে উঠে বনহুর, ঢোক গিলে বলে সূর্যমুখি তুমি!

হাঁ সর্দার অবাক হচ্ছো কেনো? কথাটা বলে ভিতরে প্রবেশ করে সূর্যমুখি। ঠোঁট দু'খানা আলতার রঙে রাঙা। ঝলমলে পোশাক পরে, খোপায় জরির ঝুরঝুরি ফুল। কানে কানবালা। চোখে কাজল, সূর্যমুখী এলিয়ে দিলো দেহখানা সর্দারের বিছানায়।

বনহুর মনে মনে প্রমাদ গুণলো, কিন্তু মুখোভাবে হাসি টেনে বললো—হঠাৎ কি মনে করে সূর্য মুখি?

সব ভুলে গেছো ওস্তাদ এর মধ্যে? আজ যে আমার দিন তা জানো না?

বনহুর বলে—ও ভুলেই গিয়েছিলো সূর্যমুখী। সব ভুলেই গিয়েছিলাম। কথাটা বলে বনহুর এগিয়ে যায় ওদিকে বড় আয়নাখানার দিকে। একবার

সে তাকিয়ে দেখে নেয় নিজের চেহারাটার দিকে। না তাকে চিনতে পারবে না সূর্যমুখি। নকল ভ্রু এবং গোঁফ দিয়ে তাকে ঠিক জলদস্যু সর্দারের মতই লাগছে।

ফিরে দাঁড়ায় বনহুর, পাশের টেবিল থেকে তুলে নেয় মদের বোতলটা। বাম হাতে বোতল আর ডান হাতে কাঁচ পাত্র। ছিপিটা বনহুর দাঁত দিয়ে খুলে ফেলে তারপর গেলাসে ঢেলে এগিয়ে আসে বিছানার পাশে। বাড়িয়ে ধরে বনহুর সূর্যমুখির দিকে—নাও?

সূর্যমুখি খিল খিল করে হেসে উঠে বসে বিছানায়, বলে সে—খুব তো দরদ দেখছি। এমন তো আদর করে কোনদিন খেতে দাওনি.....

সূর্যমুখির কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে বনহুর—তোমাকে বেশি ভালবাসি কিনা তাই। নাও খেয়ে একটা নাচ দেখাও দেখি।

সূর্যমুখি অভিমানে মুখ ভার করে বলে—আজ যে বড় নতুন কথা শোনালে ওস্তাদ। তোমাকে নাচ দেখানোর জন্য তো আছে সুরমা। সুরমার নাচ ছাড়া আমার নাচ তোমার পছন্দ হবে? সূর্যমুখি ঢলে পড়ে বনহুরের কোলে, দু'হাতে গলা ধরে বলে—ওস্তাদ তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো?

তাই নাকি?

সত্যি তুমি ক'দিন হলো ঠিক যেন পাল্‌টে গেছো। আমাকে তেমন করে আর আদর করোনা। মনিমালাও অভিমান করেছে তার সঙ্গেও তুমি ভাল ব্যবহার করোনা। বুঝেছি ঐ নতুন মেয়েটা তোমার মন জয় করে নিয়েছে।

কি যে বলো সূর্যমুখি নতুন মেয়েটাকে আমার মোটেই পছন্দ নয়।

তবে যে তাকে নিয়ে আমোদ আহলাদ করো?

হেসে বলে বনহুর—এটা কি আজ নতুন। যাক ওসব কথা, নাও খেয়ে নাও দেখি।

তুমি খাবে না?

আমার জন্য তো বহু আছে। খাও সূর্যমুখি.....

সূর্যমুখি বনহুরের হাতখানা ধরে গেলাসটা নিজের মুখে চেপে ধরে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলে।

বনহুর পুনরায় গেলাসটা পূর্ণ করে বলে—আর একটু খাও।

উঁ হুঁ বেশি খেতে পারবো না।

খাও...আর একটু খাও প্রিয়া।

সূর্যমুখি নতুন এ সম্বোধনে উল্লাসিত হয়ে উঠে, এ ডাক সে কোন দিন সর্দারের মুখে শোনে নি। সর্দার ডেকেছে পিয়ারী, মেরাজান, মেরী কলিজা এমনি কত কি কিন্তু আজ সর্দারের মুখে প্রিয়া ডাক অভিভূত করে তোলে। সূর্য মুখির চোখে তখন নেশা ধরে এসেছে। বনহুর ওর মুখে গেলাস ধরতেই আবার সে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে।

বনহুর পর পর কয়েক গেলাস ওকে খাইয়ে দেয়।

ধীরে ধীরে সূর্যমুখির চোখ দু'টো মুদে আসে। এলিয়ে পড়ে ওর দেহখানা বনহুরের কোলের উপর।

বনহুরের মুখে ফুটে উঠে এক ঘৃণাপূর্ণ ক্ষীণ হাসির রেখা। আলগোছে সে ওকে শুইয়ে দিলো নিজের বিছানায়। তারপর বনহুর উঠে দাঁড়ালো, পায়চারী করতে লাগলো ক্যাবিনের মেঝেতে।

এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে তাকালো সূর্যমুখির সংজ্ঞাহীন দেহটার দিকে। মনে মনে ভাবলো ওর অপরাধ কি অপরাধ যারা ওকে এই জঘন্য কাজে অভ্যস্ত করে তুলেছে তাদের। নারী জাতি অবলা অসহায় তাদের নিয়ে ওরা যা খুশি তাই করে ওরা যেন ওদের খেলার পুতুল।

বনহুর সোফায় বসে পা দু'খানা তুলে দিলো সম্মুখস্থ টেবিলে তারপর সিগারেট ধরালো। চোখ দুটো বন্ধ করে ভাবতে লাগলো তার জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং শেষ কোথায়।

❑

ভোরে ঘুম ভাংতেই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে বনহুর। সমস্ত রাত সে সোফায় অঘোরে ঘুমিয়েছে, কখন যে ভোর হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। ঘাড়টা এক পাশে কাৎ হয়ে থাকায় কেমন ব্যথা অনুভব করছে ঘাড়ে। হাত দিয়ে ঘাড়টা একটু রগড়ে নিলো সে। সম্মুখে তাকাতেই নজরে পড়লো সূর্যমুখি এখনও সংজ্ঞাহীনের মত ঘুমাচ্ছে।

বনহুর একটা সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করতে যাবে অমনি দরজায় ধাক্কা পড়লো—ওস্তাদ। ওস্তাদ.....

বনহুর তাড়াতাড়ি সূর্যমুখিকে বিছানার এক পাশে সরে শুইয়ে দিয়ে অপর বালিশখানা ঠিক সূর্যমুখির বালিশটার পাশে রাখলো যেন এই মুহূর্তে সে শয্যা ত্যাগ করে উঠে গেছে। দরজা খুলে দিতেই একজন জলদস্যু প্রবেশ করলো সেই ক্যাবিনে। ওস্তাদকে ছালাম জানিয়ে বললো—হুকুম করুন কি করতে হবে?

বনহুর ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাবলো কি করবার জন্য নির্দেশ দেবে সে, তবু একটু ভেবে নিয়ে বললো—সূর্যমুখিকে নিয়ে যাও এবং তার নিজের ক্যাবিনে শুইয়ে দাও।

আচ্ছা ওস্তাদ। কথাটা বলে সে বেরিয়ে যায় একটু পরে দু'জন ফিরে আসে। সূর্যমুখিকে ওরা বের করে নিয়ে যায় কাধে তুলে।

বনহুর এবার মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকায় সে সম্মুখের সীমাহীন নীল আকাশের দিকে! মনটা অনেকখানি হাল্কা লাগছে কারণ আজও তাকে ওরা কেউ চিনতে পারেনি। যা হোক এবার তার কাজ শুরু করতে হবে। জলদস্যুদের আস্তানা কোথায় তাকে জেনে নিতে হবে তারপর হুসনাকে উদ্ধার করতে হবে এবং পৌঁছে দিতে হবে তার পিতামাতার কাছে।

চীন সাগর পাড়ি দিচ্ছে জাহাজখানা। চারিদিকে শুধু থৈ থৈ পানি। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছড়ে আছড়ে পড়েছে জাহাজের গায়ে।

আকাশ মেঘ মুক্ত।

আকাশখানা গিয়ে ঠেকেছে সাগরের বুকে। তার বা গাছপালার চিহ্ন কোথাও নাই। আকাশে কোন পাখি উড়তে দেখা যায় না। শুধু নীল আর নীল চারিদিক। বনহুর হঠাৎ চমকে উঠলো, কারো ভারী বুটের শব্দ কানে এলো তার।

পিছনে ফিরে তাকাতেই জলদস্যু সর্দারের সহকারী কাফ্রী তাকে জানালো দূরে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু জাহাজখানা পুলিশ বাহিনীর বলে মনে হচ্ছে।

ভ্রু কুঁচকে বললো বনহুর—পুলিশ।

হাঁ—চীনা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ বাহিনীর জাহাজ বলে মনে হচ্ছে।

কি করে তুমি বুঝতে পারলে কাফ্রী?

তুমি দেখছি দিন দিন কেমন বোকা বনে যাচ্ছো। আমাদের পাওয়ার ফুল বাইনোকুলারে জাহাজের গায়ে লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে।

তাই বলো! ওরা তো অনেকদিন থেকে আমাদের সন্ধানে চীন সাগর চষে বেড়োচ্ছে। যাহোক আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না।

ক্ষতি ওরা করতে না পারলেও আমরা ছাড়বোনা। সাবমেরিন দিয়ে পুলিশ জাহাটিকে ঘায়েল করে দেবো।

হাঁ ঠিক বলেছো কাফ্রী। জাহাজখানাতে নিশ্চয়ই পুলিশ ফোর্স এবং নানা রকম অস্ত্র শস্ত্র আছে এ সব আমাদের নষ্ট করতেই হবে। যাতে এরা আর কোনদিন আমাদের পিছু না নিতে পারে। কিন্তু সাব মেরিন নিয়ে পুলিশ জাহাজের ক্ষতি সাধন করতে গেলে আমাদেরও কিছু ক্ষতি হবে কাফ্রী। সাবমেরিনখানা বিনষ্ট হতে পারে। এ[illegible] থেমে বললো—বনহুর কাফ্রী।

বলুন ওস্তাদ?

সাবমেরিনখানা চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।

ওস্তাদ।

হাঁ কাফ্রী আমি জানি তুমি আমার আদেশ অমান্য করবেনা।

কাফ্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—রাঘু মাধা এরাও তো সাবমেরিন চালাতে জানে ওস্তাদ।

কিন্তু ওদের পাঠিয়ে ভরসা পাচ্ছিনা। কারণ ওরা গিয়ে যদি ঠিক মত কাজ সমাধা করতে না পারে তখন পুলিশ বাহিনীর কামান, মেশিন গান আমাদের জাহাজকে রেহাই দেবে না তার চেয়ে তুমি নিজে যাও সাবমেরিন চালনায় তুমি দক্ষ আমি জানি।

অবশ্য বনহুর আন্দাজে কথাটা বলেনি, একদিন কথাবার্তা এবং কাজের মাধ্যমে বনহুর জেনে নিয়েছিলো জলদস্যুদের জাহাজের নিচের কোন অংশে ডুবানো অবস্থায় রয়েছে ছোট্ট একটি সাবমেরিন। সাবমেরিনটা ছোট্ট হলেও

অত্যন্ত কার্যকরী এবং শক্তিসম্পন্ন। এ জাহাজে তিন চারজন সাবমেরিন চালনা জানে রাঘু, মাধা আর কাফ্রী। আরও দুজন অনুচর এরাও সাবমেরিন চালনায় দক্ষ ছিলো। বনহুর এই ক'দিনের মধ্যেই জলদস্যুদের সবকিছু জেনে নিতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুর এটাও ভাল করে উপলব্দি করতে পেরেছে এই জলদস্যু দলটি অত্যন্ত ধূর্ত এবং ভয়ঙ্কর। এদের জাহাজে কয়েকটি সাংঘাতিক মেশিন আছে যে মেশিন দ্বারা জলদস্যুগণ বিভিন্ন আকারে দস্যুতা করে থাকে। সাবমেরিন যোগে এরা ডুবুভাবে অপর জাহাজের তলায় গিয়ে এমন একটি মেশিন সংযোগ করে দেয় যার দরুন জাহাজটির তলদেশে একটি বিরাট ফুটো বা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ তলিয়ে যায় না, ধীরে ধীরে জাহাজখানা যখন তলিয়ে যেতে থাকে তখন এরা নিজেদের জাহাজ নিয়ে আক্রমণ চালায় মৃত্যু প্রায় যাত্রীদের উপর। হত্যা করে লুটতরাজ করে এরা ইচ্ছামত।

প্রত্যেকটা যন্ত্র এবং মেশিন বনহুর পরীক্ষা করে দেখেছে সবচেয়ে চুম্বক মেশিনটাই এ জাহাজের একটি অদ্ভুত মেশিন। যে মেশিনের সুইচ অন করবার সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল দূর থেকে যে কোন জাহাজকে টেনে আনা সম্ভব হয়।

বনহুরের কথায় কাফ্রী কিছুটা দমে গেলো। সে মাথা নিচু করে কিছু ভাবছে ঠিক ঐ মুহূর্তে অপর একজন অনুচর এসে জানারো গোয়েন্দা বিভাগের জাহাজখানা এদিকেই আসছে ওস্তাদ।

বনহুর বললো—তাই নাকি।

হাঁ ওস্তাদ।

কাফ্রী?

বলুন ওস্তাদ?

মোটেই বিলম্ব করা উচিৎ নয় এই মুহূর্তে তুমি যাও। মনে রেখো অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হবে।

কাফ্রীর মুখ বিবর্ণ হয়ে আসে, কিন্তু সর্দারের কথা অমান্য করতে পারে না। কাফ্রী দ্রুত পোশাক পাল্টাতে চলে যায়।

বনহুর বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়ায় ডেকের একপাশে সুউচ্চ একস্থানে। চীনা পুলিশ বাহিনী কম নয়। বনহুরকে এবার পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সত্যই জলদস্যু সর্দারের ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে। যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে এ জাহাজখানাকে। কারণ না হলে জলদস্যু সর্দার হিসাবেই তাকে বন্দী হতে হবে চীনা পুলিশ বাহিনীর হাতে। কিছুতেই তারা তাকে মুক্তি দেবে না বা বিশ্বাস করবে না সে জলদস্যু নয়।

বনহুর যখন মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলো জাহাজখানাকে তখন কাফ্রী সাবমেরিন চালকের বেশে এসে দাঁড়ায়—ওস্তাদ চললাম?

বনহুর বললো—যাও, কিন্তু সাবধান, ঠিক মত কাজ করে ফিরে আসবে, না হলে তোমার শাস্তি পেতে হবে।

আচ্ছা ওস্তাদ। কথাটা বলে বিদায় নিয়ে চয়ে যায় কাফ্রী।

কিছুটা এগুতেই হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কাফ্রী লুটিয়ে পড়ে ভূতলে।

বনহুর ফিরে তাকিয়েই দেখতে পায় কাফ্রীর দেহখানা খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেছে। পুলিশ জাহাজ থেকে একটা মেশিন গানের গুলি এসে পড়েছে এ জাহাজখানার ডেকে।

বনহুর ছুটে যায় ক্যাবিনে।

কয়েকজন জলদস্যু সহ নিজে অস্ত্র চালাতে শুরু করে। পাল্টা মেশিন গানের গুলি বিনিময় চলে।

শুরু হয় যুদ্ধ।

চীনা পুলিশ বাহিনী আর জলদস্যু সে এক ভীষণ ব্যাপার। জলদস্যুদের পক্ষে রয়েছে স্বয়ং দস্যু বনহুর সেকি তুমুল লড়াই।

মেশিনগান পুনঃ পুনঃ গর্জে উঠতে লাগলো।

দু'পক্ষ থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণ হচ্ছে।

চীন সাগরের বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিভূত হয়ে আসছে। গোলা বারুদের ঝলসানিতে এক-একবার বিদ্যুৎ চমকানির মত সমস্ত সাগর বক্ষ আলোকিত হয়ে উঠছে।

প্রচণ্ড আওয়াজ আর আলোর ঝলকানিতে মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি তছনছ হয়ে যাবে। বনহুর নিজে ভারী মেশিন গানটার পাশে দাঁড়িয়ে অবিরাম গুলি বর্ষণ করে চলেছে। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে তবু একটি গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না।

যতই অন্ধকার বাড়ছে ততই চীন সাগরের আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। মেশিনগান এবং কামানের গগনভেদী গর্জনে মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক।

পুলিশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত কামান ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। তবু তারা জলদস্যুদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

অবশ্য চীনা পুলিশ বাহিনীর কাছে এতোক্ষণ জলদস্যুরা তাদের জাহাজ নিয়ে টিকে থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ। দস্যু বনুহুর কৌশলে অস্ত্র চালনা করে এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে জাহাজখানাকে চালানোর নির্দেশ দিয়ে পুলিশের গোলাগুলি থেকে নিজেদের রক্ষা করে চললো।

অন্ধকার যতই গভীর আকার ধারণ করলো ততই পুলিশ বাহিনীর জাহাজখানা পিছু হটতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর জাহাজ অন্ধকারে আত্মগোপন করে সরে পড়তে বাধ্য হলো।

জলদস্যুগণ বুঝতে পারলো পুলিশ বাহিনীর জাহাজ তাদের কাছে পরাজয় বরণ করে পালাতে বাধ্য হলো।

অল্প কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শান্ত এবং নীরব হয়ে এলো চীন সাগর।

জলদস্যুদের আনন্দ আর হর্ষধ্বনিতে ভরে উঠে জাহাজের অভ্যন্তর। তারা সর্দারকে ঘিরে নানা রকম আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে। সর্দার যে এমন দক্ষতার সঙ্গে মেশিনগান চালাতে পারে এর আগে অনুচরদের জানা ছিলো না।

এমন একটা বিপদ কেটে যাওয়ায় জলদস্যুগণ সর্দারের চার পাশে নৃত্য শুরু করে দিলো।

বনহুর জাহাজটাকে সোজা উত্তর পূর্ব দিক লক্ষ্য করে চালানোর নির্দেশ দিয়ে নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলো। পুরো কয়েক ঘন্টা অবিরাম সে একটানা ভারী মেশিনগান চালিয়ে এসেছে। ক্লান্ত দেহটা বনহুর এলিয়ে দিলো শয্যায়।

ঐ মুহূর্তে মনিমালা এবং সূর্যমুখি এসে বসলো বনহুরের দুপাশে। একটি অনুচর বড় রেকাবীতে করে নানা রকম খাবার এবং বড় এক বোতল মদ এনে রেখে গেলো।

বনহুর মনে মনে বিরক্ত বোধ করলেও সে সংযত রইলো কারণ সে এখন দস্যু বনহুর নয় সে এখন জলদস্যু সর্দার জবরু। কাজেই সূর্যমুখি এবং মনিমালা কোন ভুল করে নাই। তারা জানে তাদের সর্দার কিসে খুশি হয় এবং সে কারণেই তারা এসেছে সর্দারকে খুশি করতে। তার অনুচররাও নিয়মের ব্যতিক্রম করেনি কিছু। সর্দার ক্লান্ত হলে যা খেতো তাই তারা এনে হাজির করেছে।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো মনিমালা এবং সূর্যমুখিকে লক্ষ্য করে বললো—যাও আজ তোমাদের ছুটি। তোমরা ইচ্ছামত মন যা চায় করতে পারো। এই নাও...কথাটা বলে রেকাবী থেকে দুটো মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে দুজনার মুখে গুঁজে দিলো।

সূর্যমুখি আর মনিমালা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সর্দারের মুখের দিকে তারপর ওরা বেরিয়ে গেলো মন্থর গতিতে।

সর্দার তো তাদের এমন করে কোনদিন ফিরিয়ে দেয় নাই। আজকাল কি হয়েছে সর্দারের ভেবে পায় না ওরা।

সূর্যমুখি আর মনিমালা সর্দারের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই অনুচরগণ বেশ ঘাবড়ে গেলো। তারা এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত হলো।

জিজ্ঞাসা করলো কোরা—কি গো সূর্য চলে এলে কেনো?

জানিনা! অভিমানে মুখ ভার করে জবাব দিলো সূর্যমুখি।

মনিমালা বললো...নতুন মেয়েটা আসার পর থেকে সর্দার যেন কেমন হয়ে গেছে।

সূর্যমুখি বলে উঠে—সত্যি বলেছিস ভাই সর্দার আজকাল আমাদের কাছে ঘেষতেই চায় না। সব সময় এড়িয়ে যায়।

মনিমালা বলে—তোকে তবু আদর করে কাছে নেয় কিন্তু আমাকে একেবারে দেখতেই পারে না।

কোরা বলে উঠলো—দুঃখ করিস না মনিমালা আমরা তো আছি তোদের আদর কোনদিন কমবে না।

মনিমালা বলে—তোমরা পুরুষ জাতটাই ঐ রকম নতুন নতুন কত না আদর যত্ন করে পরে কেয়ারই করতে চায় না।

এমন সময় মাধা এসে হাজির—কি এতো গল্প হচ্ছেরে তোদের।

কোরা বলে উঠে—কি আর হবে সর্দার আজকাল সূর্যমুখি আর মনিমালাকে তেমন আদর করে না।

তাই নাকি?

হাঁ তাই তো ওরা বলছে।

তবে সুরমার আদর কিন্তু কমেনি, সর্দার ওর নাচ দেখে পাগল আর কি।

সূর্যমুখি অভিমান ভরা গলায় বলে...আমরা তো আর নাচর্তে জানি না, সুরমা নাচতে জানে তাই সর্দার ওকে ভালবাসে। তাছাড়া ঐ নতুন মেয়েটার জন্য সর্দার এখন ব্যস্ত।

কোরা বলে উঠে—মাধা সর্দার মনিমালা আর সূর্যমুখিকে যখন বিদায় করেছে তখন হয় সুরমা নয় নতুন মেয়েটার ডাক পড়বে।

মাধা বলে উঠে—ডাক পড়বার আগেই ওকে পৌছে দিয়ে আয় না ভাই।

ঠিক বলেছিস সব কথা কি আর সর্দার মুখে বলবে। আজকাল সর্দার কথা খুব কম বলে। দেখিস না দরকার না পড়লে কথাই বলতে চায় না। কেমন যেন সব সময় নিজের ক্যাবিনে বসে থাকতে ভালবাসে।

যাক ওসব নিয়ে মাথা ঘাঁমাতে চাইনা। চল্ নতুনকে দিয়ে আসি। বললো কোরা।

মনিমালা রাগে গস্ গস্ করে বললো—তোমরাই সর্দারের মাথাটা খেয়েছো।

বললো সূর্যমুখি—ঐ মেয়েটাকে না আনলে সর্দার অমন বিগড়াতো না বুঝলে? যত দোষ তোমাদের।

হোক, সর্দারকে খুশি করাই আমাদের কাজ। বলে উঠে দাঁড়ালো মাধা।

কোরা বললো—আজ দেখলে তো সর্দার যদি ঠিকমত যুদ্ধ চালাতে না পারতো তাহলে নির্ঘাৎ পুলিশ বাহিনী আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতো। ভাগ্যিস সর্দার মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি চালিয়ে ওদের কাবু করতে পেরেছিলো তবেই না রক্ষা পেলাম।

মাধা বলে—নে চল চল নতুনকে দিয়ে আসি।

সূর্যমুখি আর মনিমালা বাঁকা চোখে তাকায় ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে।

বনহুর সবেমাত্র বিশ্রামের জন্য বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। এ মুহূর্তে তার শরীরে কোন ছদ্মবেশ নেই। কারণ সে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ভালভাবে ক্যাবিনের কোন জানালাও উন্মুক্ত নেই কাজেই বনহুর নিশ্চিন্ত। এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে।

বনহুর বিরক্ত হয় তবু সে দরজা খুলে দেয় অবশ্য দরজা খুলবার পূর্বেই সে আলো নিভিয়ে দেয়।

কোরা আর মাধা হুসানাকে ঠেলে দিলো সেই ক্যাবিনের মধ্যে তারপর বললো মাধা—ওস্তাদ নতুন মেয়েটাকে দিয়ে গেলাম।

কোরা আর মাধা হুসনাকে ঠেলে দিতেই হুসনা অন্ধকারে ক্যাবিনের মধ্যে কারো গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। বলিষ্ঠ দুটি বাহু ধরে ফেললো তাকে।

হুসনার সমস্ত দেহখানা বলিষ্ঠ দুটি বাহুর ছোঁয়ায় শিহরিত হলো। বনহুর ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে অন্ধকারেই দরজা বন্ধ করে দিলো তারপর সুইচ টিপে আলো জালালো।

সঙ্গে সঙ্গে হুসনা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, একি দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো হুসনার। যদিও সেদিন ওকে সে দেখেছিলো খানিকটা তবু এমন স্বাভাবিকভাবে নয়। অপূর্ব পৌরুষ দীপ্ত একটি মুখ।

হুসনাকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বলে বনহুর—কি দেখেছেন?

লজ্জায় তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে হুসনা—না কিছু না।

বনহুর বলে—বুঝেছি আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন আমি কেমনভাবে আত্মগোপন করে এদের সর্দার হয়ে বসে আছি। আপনাকে তো আগেই বলেছি আমি এবং আপনি একই জাহাজের যাত্রী ছিলাম। আমরা উভয়েই জলদস্যুদের বন্দী.....

এবার হুসনা কথা বলে—আমি শুনেছি আপনিই যুদ্ধ করে পুলিশ জাহাজকে হটিয়ে দিয়েছেন। কেনো এ কাজ করলেন আপনি? পুলিশ জাহাজ যদি জল দস্যুদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হতো তাহলে আমরা বেঁচে যেতাম। পুলিশগণ নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করতো।

বনহুর সোফা দেখিয়ে বললো—বসুন।

নিজেও বসে পড়লো একটি সোফায়।

হুসনা তখন বসে পড়েছে জড়োসড়ো হয়ে। সংকুচিত তার মুখোভাব। মাঝে মাঝে সে লজ্জা নত দৃষ্টি তুলে তাকাচ্ছিলো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে কয়েক মুখ ধোয়া ত্যাগ করে বললো—আপনি যা বললেন মিস হুসনা তা সত্য। কিন্তু পুলিশ বাহিনী কিছুতেই বিশ্বাস করতো না—আমি জলদস্যু সর্দার নই। তবে আপনি উদ্ধার পেতেন এ সুনিশ্চয়। মিস হুসনা আপনাকে আমি কিছু সময় কষ্ট দেবো।

কষ্ট। নানা আপনি আমার হিতাকাঙ্খী আমি জানি।

হাঁ, এ বিশ্বাস আপনি আমার উপর রাখবেন কেমন! মিস হুসনা আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে ঠিক্ আপনার বাবা মার কাছে পৌছে দেবো। আপনি ভরসা হারাবেন না কোন সময়।

হুসনার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো কৃতজ্ঞতায়। অল্পক্ষণেই ফোটা ফোটা অশ্রু ঝরে পড়লো তার গন্ডবেয়ে।

বনহুর হুসনার দিকে ফিরে তাকাতেই আশ্চর্য হলো, সোজা হয়ে বসে বললো আপনি কাঁদছেন মিস হুসনা।

আঁচলে চোখ মুছলো হুসনা।

বনহুর বললো—জানি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে আমি অনুচরদের সবাইকে বলে দিয়েছি কেউ যেন আপনার প্রতি কোন অসৎ ব্যবহার না করে।

জানি আর জানি বলেই আজও আমি আত্মহত্যা করিনি।

আত্মহত্যা! আত্মহত্যা করবেন আপনি?

বলুন এ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি লাভ হবে! কি লাভ হবে বাবা মার কাছে ফিরে গিয়ে? ফুপিয়ে কেঁদে উঠে হুসনা।

বনহুর বলে—আবার আপনি অবুঝ হলেন মিস হুসনা। যা ঘটে গেছে তা তো আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। সেজন্য আপনি দায়ী বা দোষীও হতে পারেন না। আপনার বাবা মা আপনাকে ফিরে পেয়ে যারপর নাই খুশি হবেন। মেয়েদের ধর্ম বিয়ে করা। আপনি বিয়ে করে সুখী এবং সুন্দর জীবন উপভোগ করবেন।

না না তা হয়না আমি পারবো না কাউকে ঠকাতে। আমার এ পাপ জীবন নিয়ে কারো সঙ্গে আমি ছলনা করতে পারবো না।

আবার আপনি নিজেকে দোষী মনে করছেন মিস হুসনা। এ আপনার অন্যায় দুশ্চিন্তা। মিস হুসনা আপনি এবার শুয়ে পড়ুন।

না তা হয়না, আপনি আজ বড় ক্লান্ত।

একটু হেসে বললো বনহুর—আমার কথা ছেড়ে দিন।

আপনি বিছানায় ঘুমান আমি সোফায় বসে আছি।

তা হয়না মিস হুসনা আপনিই ঘুমান।

হুসনা বলে উঠে—জানিনা আপনি কে। এতো মহৎ আপনি কোন অজানা অচেনা পুরুষের কাছে মেয়েরা কোনদিন নিরাপদ নয় কিন্তু আপনার কাছে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ রয়েছি.....একটু থেমে বলে—কি বলে যে আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাইনা।

মিস হুসনা আমি মেয়েদের যতই দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি সত্যি মেয়েরা অদ্ভুত এক সৃষ্টি। পুরুষদের কাছে মেয়েরা সব সময় নিজেকে দুর্বল বলে মনে করে। কিন্তু কেন মেয়েদের এই দুর্বলতা বলুন তো? কেন আপনারা কি মানুষ নন? পুরুষ মানুষ যেমন তেমনি নারী জাতি।

হুসনা বললো—আপনি মহান তাই একথা আপনি বলতে পারছেন। আপনার কাছে হয়তো পুরুষ নারী সমান মর্যাদার অধিকারী কিন্তু সব জায়গায় নয়। একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো জবাব দেবেন?

বলুন দেবো?

আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? যদি বলতে কোন আপত্তি না থাকে.....

নিশ্চয়ই বলবো—আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার কাজ ব্যবসা করা এবং সে কারণেই আমি জিয়াংহায় এসেছিলাম।

কিন্তু আপনাকে ব্যবসায়ী বলে মনে হয় না।

আপনার ধারণা?

আপনি হয়তো বা কবি সাহিত্যিক বা.....

বলুন?

—কোন শিল্পী।

এ সবের কোনটাই আমি নই মিস হুসনা। তবে এবার শুনুন—ব্যবসা আমার নেশা নয় বা পেশা নয়। বাধ্য হয়ে ব্যবসা করি। নাম আমার মনির চৌধুরী। তবে যে কয়েকদিন আমরা এ জাহাজে কাটাবো আমাকে আপনি মনির বলেই ডাকবেন।

হুসনা হেসে বললো—যদি শেষ অংশই বেছে নেই।

বেশ তাও ভাল যা আপনার খুশি তাই বলে ডাকবেন। নিন শুয়ে পড়ুন এবার বিছানায় গিয়ে।

না ঘুম আমার আসছে না। আপনি বিছানায় শোন আমি জেগে থাকবো।

জেগে থাকবেন কিন্তু কেনো?

বলেছি ঘুম পাচ্ছে না।

বেশ জেগে থাকুন, আমি ঘুমাবো। বনহুর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দেয়।

হুসনা বসে থাকে সোফায়।

রাত বেড়ে গভীর হয়ে আসে।

হুসনা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় এগিয়ে আসে বিছানার পাশে।

অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর।

হুসনা বনহুরের শিয়রে বসে আলগোছে হাতখানা রাখে বনহুরের মাথায়। একটু একটু করে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

ঘুম ভেঙ্গে যায় বনহুরের চোখ মেলে তাকায় বলে—আপনি!

আপনি ঘুমান মিঃ চৌধুরী আমি আপনার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

কষ্ট হচ্ছে না আপনার!

না।

সত্যি মেয়েদের সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে আমি মাঝে মাঝে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমি ঘুমাবো আর আপনি.....

কথা না বলে ঘুমান আমি বেশি খুশি হবো।

বেশ তাই হোক।

বনহুর চোখ বন্ধ করলো।

হুসনা বনহুরের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

হুসনাও এক সময় পাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরে ঘুম ভেংগে যেতেই হুসনা লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে যায়। একি সে ওর বিছানায় এমনভাবে শুয়ে আছে ছিঃ ছিঃ কি ভাববে মনির চৌধুরী।

হুসনা উঠে এসে দাঁড়ায় ওপাশের মুক্ত শার্শী দিয়ে তাকায় সাগর বক্ষে। সীমাহীন জলরাশি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে হুসনা।

এমন সময় পিছনে এসে দাঁড়ায় বনহুর। দু'চোখে তখনও ঘুমের আবেশ। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করছে কিছুটা লালও বটে। হঠাৎ কেউ দেখলে নিশ্চয়ই মনে করবে কতনা নেশা করে সে। হুসনাকে লক্ষ্য করে বলে বনহুর—কি দেখছেন অমন করে।

হুসনা চমকে ফিরে তাকায়, অস্ফুট কণ্ঠে বলে—আপনি!

হাঁ।

ঘুম হলো?

হয়েছে।

আর একটু ঘুমালেই পারতেন মিঃ চৌধুরী।

না হঠাৎ আমার অনুচররা এসে পড়তে পারে তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলাম না। মিস হুসনা?

বলুন?

আমার ক্যাবিনে আপনাকে রাত কাটাতে হচ্ছে এতে কোন অসুবিধা বোধ করছেন না তো?

মিঃ চৌধুরী আপনি মহান, কি বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো সে ভাষা আমার জানা নেই। এই অথৈই সাগরে জলদস্যুদের জাহাজে আপনি যে আমার ভরসা।

জানি না মিস হুসনা আপনাকে শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের কবল থেকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কিনা। তবে যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

❑

মনিমালা এসে দাঁড়ালো পিছনে সূর্যমুখি। উভয়ের চোখে মুখেই একটা ক্রোধের ভাব বিরাজ করছে।

হুসনা বসেছিলো নিজের ক্যাবিনে। আজ তার মুখোভাব প্রসন্ন, মনে তার আনন্দ উচ্ছ্বাস। সে যে জলদস্যুদের জাহাজে আটক আছে এক কথা ভুলে গেছে যেন। রাত এবং সকালের স্মৃতিগুলো তার হৃদয়ে এক অনাবিল খুশির উৎস বয়ে আনছিলো। অকুল সাগরে যে মানিকের সন্ধান পেয়েছে। মানিকের চেয়েও অমূল্য তার কাছে মনির চৌধুরী। সকালে ওর কথাগুলির প্রতিধ্বনি জাগছিলো তার কানের কাছে...মিস হুসনা আপনাকে আমার ক্যাবিনে রাত কাটাতে হচ্ছে এতে কোন অসুবিধা বোধ করছেন না তো। নিজের কথার প্রতিধ্বনি জাগে...মিঃ চৌধুরী আপনি মহান কি বলে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো সে ভাষা আমার জানা নেই। এই অথৈ সাগরে

জলদস্যুদের জাহাজে আপনি আমার ভরসা। ওর কথাগুলো ভেসে উঠে এবার—জানিনা মিস হুসনা আপনাকে শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের কবল থেকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো কি না। তবে যতক্ষণ আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত...

হুসনার চিন্তাধার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, মনিমালা তার দেহে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠে—কি ভাবছো মেয়ে আজ যে বড় খুশি খুশি লাগছে তোমাকে। বলি সর্দারকে বশ করে নিলে একেবারে?

হুসনা ধাক্কা খেয়েই উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবারে সে অসহায় করুণ চোখে তাকালো মনিমালা তারপর সূর্যমুখির দিকে।

সূর্যমুখি বলে উঠলো—তুমি মনে করোনা চিরদিন সর্দার তোমার বশে থাকবে। যে ক'দিন রস আছে সেই ক'দিন তারপর ফেলে দেবে নারকেলের ছোবড়ার মত বুঝলে।

মনিমালা বলে উঠে—ওকে পেয়েই তো সর্দার আমাদের কথা ভুলে গেছে।

সূর্যমুখি মুখ বাঁকা করে বলে—আজ সর্দারের কাছে গেলাম সর্দার তেমন করে কথাই বললো না আদর করা তো দূরের কথা।

মনিমালা বললো—এখন আদর করার মানুষ তো এসে গেছে আমরা আবার কি? শোন মেয়ে তুমি যাই করো সর্দারকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

এমন সময় সুরমা বাঈ এসে দাঁড়ায় মনিমালা কথার শেষ অংশ তার কানে গিয়েছিলো বললো সে, ওর কি দোষ সব দোষ কোরা আর মাধার। ওরাইতো সর্দারকে খুশি করবার জন্য ওকে ধরে এনেছে ঐ জাহাজ থেকে।

সূর্য মুখি বলে উঠে—সুরমা তুই তো বলবিই তোর আদর তো কমেনি। রোজ একবার করে সর্দার তোর নাচ দেখে বাহবা দেয় কত ফুর্তি করে তোকে নিয়ে।

সুরমার মুখ খানা গম্ভীর হয়ে পড়ে, অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে —নাচ দেখলেই আদর করা হয়না বুঝলি সূর্য। সর্দার কোনদিন একটা ভাল কথাও বলে না আমার সঙ্গে। সব সময় দূরে দূরে সরিয়ে রাখে।

সবাই যখন সর্দারের কথা নিয়ে নানা রকম আলোচনা করছে। তখন হুসনার মনের পর্দায় ভাসছে সেই সর্দারের আর রূপ যে রূপের সঙ্গে তুলনা হয়না কারো। এক মহান দীপ্তময় পুরুষ সে। ভাবছে হুসনা সত্যি মনির চৌধুরী এতো মহৎ এতো পবিত্র। এ তো কাছে পেয়েও যে একটি নারীকেও স্পর্শ করেনি.....

হঠাৎ সেই মুহূর্তে কোরা এসে দাঁড়ায় সেখানে—সূর্যমুখি তোমরা সবাই এখানে। যাও যাও সর্দার আসছে নতুন-এর সঙ্গে দেখা করতে।

মুহূর্তে ওদের তিনজনের মুখ কালো হয়ে উঠলো। একবার ক্রোধভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তিনজন হুসনার দিকে তারপর বেরিয়ে গেলো।

কোরা বললো—আসুন ওস্তাদ!

জলদস্যু সর্দারের বেশে প্রবেশ করলো বনহুর হুসনার ক্যাবিনে।

হুসনা যেই মাত্র শুনেছিলো সর্দার আসছে সেই ক্যাবিনে তখন তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে অপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া জাগিয়ে ছিলো। আনন্দ উচ্ছাসে বুকটা কেমন টিপ টিপ করছিলো তার।

সর্দার ক্যাবিনে প্রবেশ করেই হুসনার দিকে তাকালো। হুসনাও তাকালো সর্দারের মুখের দিকে। সর্দারের মুখের অর্ধেক কালো কাপড়ে ঢাকা, মাথায় বিরাট আকারের পাগড়ী।

হুসনার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো সর্দার।

হুসনা দৃষ্টি নত করে নিলো।

সর্দার কোরাকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি যাও।

কোরা বেরিয়ে গেলো।

সরে এলো বনহুর হুসনার পাশে, চাপা কণ্ঠে বললো—মিস হুসনা আজ আপনাকে অভিনয় করতে হবে! আমার অনুচররা ধরেছে আপনাকে নিয়ে ওরা আনন্দ করবে আমার নিষেধ ওরা শুনবে না কাজেই আপনি এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

কথাটা শুনে শিউরে উঠে হুসনা, ফ্যাকাশে মুখে তাকায় সে বনহুরের মুখে।

বনহুর বুঝতে পারে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেছে হুসনা তাই বলে আবার সে—আপনি ঘাবড়াবেন না আমি তো রয়েছি...কথাটা বলে বেরিয়ে যায় বনহুর।

হুসনা নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

❑

সর্দারের আসনে সর্দার উপবিষ্ট।

তার চার পাশ ঘিরে জলদস্যুরা নানা রকম ফুর্তি আমোদ আহ্লাদ করে চলেছে। সূর্যমুখি আর মনিমালা বসে আছে সর্দারের দু'পাশে।

সুরমা নেচে চলেছে।

ক্যাবিনের মাখখানে একটা বড় টেবিলে নানরকম মদের বোতল আর কাঁচ পাত্র। যে যেমন পারছ ঢেলে খাচ্ছে আর আবোল তাবোল প্রলাপ বকছে।

সূর্যমুখি আর মনিমালাও সারাব পান করে ডগমগ, ওরা হেলে দুলে পড়ছে সর্দারের গায়ে। কখনও বা গেলাস ভর্তি করে এগিয়ে ধরছে তার মুখের কাছে।

সবাই সারাব পানে মাতোয়ারা ঐ সময় কোরা মাথা আর রাঘু এরা হুসনাকে নিয়ে আসে সেই ক্যাবিনে।

হুসনা যখন ক্যাবিনে প্রবেশ করলো তখন সূর্যমুখি সর্দারের কোলে মাথা রেখে খিল খিল করে হাসছে।

হুসনার দিকে তাকালো সর্দার।

হুসনার মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। কোরা আর মাধা হুসনাকে ধরে এনে সর্দারের গায়ে ঠেলে দিলো—নিন ওস্তাদ?

হুসনা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সর্দারের গায়ে । সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে ওকে তারপর পাশে বসিয়ে দেয়। জড়িত কণ্ঠে বলে—সুন্দরী লজ্জা করছো

কেনো? দেখছো না কেমন হাসি খুশি করছে। খাবে নাও একটু খাও.....গেলাসটা তুলে নিয়ে সর্দার ওর মুখের কাছে ধরে।

হুসনার মুখমন্ডল গম্ভীর এবং কালো হয়ে উঠেছে। মদের তীব্র গন্ধে বমি আসছে ওর।

সর্দার হুসনাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় তারপর জড়িত কণ্ঠে বলে—তোমরা আনন্দ করো আমি আমার ক্যাবিনে যাই। চলো সুন্দরী আমার ক্যাবিনে চলো। সূর্যমনি তোমরা থাকো সকালে আবার দেখা হবে।

সূর্যমুখি-মনিমালা রাগে অভিমানে একেবারে ফুলে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

সর্দার হুসনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে নিজে ক্যাবিনে।

ক্যাবিনে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়ে বনহুর।

একটানে মুখের আবরণ এবং গোঁফ জোড়া খুলে ফেলে তারপর ভ্রু দু'টো তুলে রেখে দেয় টেবিলের উপরে। ফিরে তাকায় হুসনার দিকে।

হুসনা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো, সে ভেবেছিলো মনির চৌধুরী সত্যি সত্যি বুঝি মদ পান করেছে এবং সত্যিই বুঝি তাকে এ ক্যাবিনে নিয়ে এলো তার উপর কোন অন্যায় আচরণ করবে বলে। যদিও সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না মনির চৌধুরী এতো মহৎ হয়ে এতো নিচে নেমে আসবে।

বনহুর এসে দাঁড়ায় হুসনার সম্মুখে। ওর হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরে বলে মিস হুসনা ক্ষমা করুন। যা দেখেছেন বা আপনার সঙ্গে যে আচরণ আমি করেছি সব অভিনয়।

হুসনা তাকালো এবার বনহুরের মুখের দিকে দীপ্ত উজ্বল দুটি সুন্দর চোখ স্থিরভাবে চেয়ে আছে তার মুখে। অদ্ভুত মোহময় সে দৃষ্টি।

হুসনা নিজকে স্থির রাখতে পারে না বনহুরের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠে—আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম তার জন্য আমাকে আপনি ক্ষমা করুন।

মিস হুসনা এ আপনি কি করছেন? তাড়াতাড়ি বনহুর হুসনাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়।

হুসনা মুখ গুজে বনহুরের বুকে—বলুন ক্ষমা করেছেন।

বনহুর মুহূর্তের জন্য বিব্রত-বিচলিত-হয়ে পড়ে।

ওকে চটকরে পারেনা সরিয়ে দিতে একটা গভীর অনুভূতি তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। বনহুর হুসনার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—আপনি কোন অন্যায় করেননি কেন ক্ষমা চাইছেন বলুন তো?

না আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম মিঃ চৌধুরী জীবনে বহুলোক আমার চোখে এসেছে-কিন্তু আপনার সঙ্গে তুলনা হয়না কারো।

মিস হুসনা আপনি অযথা বাড়িয়ে বলছেন, কি এমন করেছি...

যা করেছেন তা অনেকেই পারেনা বা করেনা। আপনি আমাকে নিঃসঙ্গ একা পেয়েও কোন মুহূর্তে অসংযত আচরণ করেননি। একি আপনার চরম মহত্বের পরিচয় নয়?

আপনি যা মনে করেন। কথাটা বলে বনহুর শয্যায় এসে বসে।

হুসনা বেরিয়ে যাবার জন্য ক্যাবিনের দরজার দিকে পা বাড়ায়।

বনহুর বলে আপনি এ ক্যাবিনেই থাকবেন কারণ রাতে বাহিরে বের হওয়াটা এ জাহাজে আপনার জন্য নিরাপদ নয়।

হুসনা না বেরিয়ে সোফায় বসে পড়ে।

বনহুর উঠে বাথরুমে প্রবেশ করে এবং কিছু পর জলদস্যু সর্দারের ড্রেস পাল্টে বেরিয়ে আসে যদিও সে পূর্বেই গোঁফ ভ্রু এবং মাথায় বিরাট আকার পাগড়ী খুলে ফেলেছিলো এখন সে স্বাভাবিক পোশাক পরেছে। ক্যাবিনে প্রবেশ করে আংগুল দিয়ে চুলগুলো আচড়ানের মত করে গুছিয়ে নিচ্ছিলো।

এমন সময় একটা শব্দ শোনা যায়। শব্দটাকে মেঘ গঞ্জনের মত বলে মনে হয়।

হুসনা বলে উঠে—এ কিসের শব্দ?

বনহুর একটু ভেবে বলে—ঠিক বুঝতে পারছিনা তবে মনে হচ্ছে ঝড়ের পূর্বে সমুদ্রে এরকম শব্দ শোনা যায়। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহলে আমরা বিরাট এক বিপদের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি মিস হুসনা।

শব্দটা ক্রমান্বয় আরও স্পষ্ট এবং মেঘ গর্জনের মত শোনা যাচ্ছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের পিছনের শার্শী খুলে তাকালো বাহিরের আকাশের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো সমস্ত আকাশ জমাট মেঘে ভরে উঠেছে সেকি ভীষণ অন্ধকার আর ভীষণ আওয়াজ। এক সঙ্গে যেন শত শত মেঘ গর্জন করে এগিয়ে আসছে তাদের জাহাজের দিকে।

বনহুর বললো মিস হুসনা আমরা নতুন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। সাইক্লোনের কবলে পড়েছি আমরা।

হুসনা সাইক্লোনের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি, কিন্তু নিজে কোন দিন উপভোগ করেনি। শিউরে উঠলো হুসনা বিবর্ণ মুখে বললো এখন কি হবে মিঃ চৌধুরী।

বনহুর বললো—একমাত্র খোদা ছাড়া কোন উপায় নাই। মিস হুসনা, সমস্ত জলদস্যুগণ নেশাপান করে একেবারে ভম হয়ে আছে। এতো শব্দেও কারো সাড়া নেই?

তবু আপনি এ পোশাক ত্যাগ করে জলদস্যু সর্দারের পোশাক পরে নিন মিঃ চৌধুরী না হলে ওরা এসে পড়তে পারে তখন এক বিপদে আর এক বিপদ ঘটবে। মিঃ চৌধুরী আপনার যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে আমি বাঁচবোনা। যান, যান আপনি.....

বনহুর পোশাক পালটে নেওয়ার জন্য পাশের ছোট ক্যাবিনে প্রবেশ করে।

ঐ সময় জলদস্যুদের ক্যাপটেন এসে দাঁড়ায়—ওস্তাদ ওস্তাদ...

ক্যাবিনের দরজা খুলে দেয় হুসনা।

ক্যাপটেন বলে উঠে—ওস্তাদ কোথায়?

আছে।

ঐ মুহূর্তে বেরিয়ে আসে বনহুর তার পোশাক পালটানো হয়ে গেছে বলে বনহুর—ক্যাপটেন এ কিসের শব্দ?

ক্যাপটেন ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠে—সামুদ্রিক ঝড় শুরু হয়েছে সর্দার আর রক্ষা নাই! ঝড়ের বেগ এতো বেশি বেড়ে গেছে যে কিছুতেই জাহাজ খানাকে নাবিকগণ ঠিকভাবে চালাতে পারছেনা...

জাহাজখানা তখন ভীষণভাবে দুলতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে জাহাজের ডেকে।

তুমুল ঝড়।

ক্যাপটেন ছিটকে পড়লো ডেকের উপরে।

হুসনা ছুটে এসে আকড়ে ধরলো বনহুরকে।

বনহুর কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলোনা হুসনাকে সেও আঁকড়ে ধরলো ততক্ষণে একটা বিরাট ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো জাহাজের উপরে। বনহুর আর হুসনা উভয়ে উভয়কে জাপটে ধরে রইলো। সমস্ত শরীর ভিজে চপসে গেছে।

ততক্ষণে জাহাজে জলদস্যুদের আর্তচিৎকার ভরে উঠেছে। কে কোন দিকে ছুটে পালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।

একবার কানে এলো নারী কণ্ঠে আর্তচিৎকার...ওস্তাদ...ওস্তাদ ....ও...স্তা...দ...

সূর্যমুখি কিংবা মণিমালার কণ্ঠস্বর ঠিক বোঝা গেলোনা।

হুসনা বনহুরকে জাপটে ধরে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। কিছুতেই সে ওকে ছাড়ছেনা।

জাহাজখানা এক একবার সম্পূর্ণ কাৎ হয়ে যাচ্ছে এই বুঝি ডুবে যাবে। দিশেহারা হয়ে ছুটে যাচ্ছে জাহাজখানা এলোমেলোভাবে।

ক্যাপটেন কোন রকমে জাহাজের ইঞ্জিনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো কিন্তু তখন ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে। আর রক্ষা নাই জাহাজখানা এবার তলিয়ে যেতে লাগলো।

বনহুর পূর্বেই দেখেছিলো তাদের ক্যাবিনের সম্মুখে কয়েকটি লাইফ বোট ঝুলানো আছে। বনহুর হুসনা সহ এগিয়ে গেলো এবং দ্রুত হস্তে অতি সাবধানে একটি লাইফ বোট খুলে নিলো। বললো—মিস হুসনা জাহাজখানা এই মুহূর্তে তলিয়ে যাবে আপনি খোদাকে স্মরণ করে এই রশি দেখছেন এই রশি ধরে নেমে চলুন।

আপনি?

আমি আপনার পূর্বেই নেমে যাচ্ছি হয়তো লাইফ বোটখানা উলটেও যেতে পারে তবু আপনাকে জাহাজ থেকে নামতে হবে কারণ জাহাজখানা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে যাবে।

বনহুরের কথাগুলো টুকরা টুকরো ভাবে শোনা যাচ্ছিলো কারণ এতো বেশি ঝড়ের বেগ ছিলো যার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ানোও সম্ভব ছিলোনা। হুসনা আঁকড়ে ধরলো বনহুরকে—না না আপনাকে আমি ঐ অন্ধকারময় সাগর বক্ষে নামতে দেবোনা। নামতে দেবোনা...

কিন্ত কোন উপায় নেই মিস হুসনা। আমাকে এবং আপনাকেও নামতে হবে। আসুন আমি নিচে গিয়ে রশি ধরে থাকবো। কথাটা বলে বনহুর দড়ি বেয়ে নিচে প্রচন্ড ঢেউ এর বুকে নেমে গেলো।

হুসনাও তারপর নেমে গেলো নিচে।

বনহুর বারবার চিৎকার করে বলছে—মিস হুসনা কোনক্রমে আপনি হাত খুলে দেবেন না। সাবধানে নেমে আসুন।

হুসনা ভয়ে একেবারে যা তা হয়ে গিয়েছিলো, হাত তার আপনা আপনি শিথীল হয়ে এলো কিছুটা নামতেই দড়ি থেকে খসে পড়লো হুসনা নিচে।

বনহুর যা ভেবেছিলো তাই হলো। হুসনার ভাগ্য বলতে হবে হুসনা এসে আছড়ে পড়লো লাইফ বোট সোজা। বনহুর ধরে ফেলতে সক্ষম হলো কারণ লাইফ বোটখানা তখন একটা ঢেউ এর উপরে প্রায় জাহাজের কাছাকাছি এসে পড়ে ছিলো।

বনহুর হুসনাকে জাপটে ধরে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে, রশিখানা এক ঝটকায় খসে আসে জাহাজের রেলিং থেকে। লাইফ বোটখানাও উলটে যায় সেই মুহূর্তে।

বনহুর কিন্তু অতিকষ্টেও হুসনাকে ছেড়ে দেয় না। দক্ষিণ হস্তে লাইফ বোটখানা আঁকড়ে ধরে বাম হস্তে হুসনাকে ধরে রাখে।

সেকি প্রচণ্ড ঝড়, চারিদিকে জমাট অন্ধকার, কিছু নজরে পড়ছেনা। সামুদ্রিক ঝড় সাইক্লোন মহা ভয়ঙ্কর জিনিস। বনহুর এর পূর্বে একবার সাইক্লোনের কবলে পড়েছিলো। সেবারও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা করেছিলো

বনহুর। ভাগ্যক্রমে জীবনে বেঁচে গিয়েছিলো কিন্তু এবার সে রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ।

এতো বেশি এবং প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা এক ভীষণ ব্যাপার। বনহুরের বলিষ্ঠ বাহু ও এক সময় শিথীল হয়ে এলো। ঐ মুহূর্তে সমস্ত জাহাজখানা দাউ দাউ করে জলে উঠলো।

সাগর বক্ষে তখন লক্ষ লক্ষ দানব এক সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে চলেছে। সেকি ভয়ঙ্কর ভীষণ অবস্থা তা কেউ কোন দিন কল্পনা করতেও পারেনা।

বনহুর প্রাণ পণে আঁকড়ে ধরে থাকে হুসনাকে।

❑

একদল জেলে আর জেলেনি সমুদ্রে তাদের সঙ্গী সাথীদের সন্ধান করে ফিরছিলো। গতকাল সাইক্লোনে তাদের বহু জেলে নৌকা ডুবে গেছে। তাই জেলেরা তাদের আত্নীয় স্বজনদের খুঁজে ফিরছিলো সমুদ্রের তীরে তীরে কেউ বা নৌকা নিয়ে কেউ বা পায়ে হেটে হেটে।

জেলেরা সাইক্লোন ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু এমন সাইক্লোন তারা কমই দেখেছে। এই সাইক্লোনে সাগরে কত শত শত জাহাজ ডুবেছে, কত হাজার হাজার নৌকা ডুবি হয়েছে, কত মানুষ মরেছে, কত সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

জেলেরা যখন নিজেদের আত্নীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবের সন্ধান করে ফিরছে তখন হঠাৎ একদল জেলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো দূরে বালুচরের বুকে। পাশা পাশি দুটো মানুষ পড়ে আছে।

জেলেরা তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো।

গিয়ে দেখলো সত্যি দুটো মানুষ পড়ে আছে। একটি পুরুষ একটি মেয়ে। মেয়েটার শাড়ির কিছু অংশ জড়িয়ে আছে পুরুষটির দেহের সঙ্গে। মেয়েটি উঁবু হয়ে আছে আর পুরুষটি চীৎ হয়ে।

জেলেদের মধ্যে একজন প্রবীণ জেলে বলে উঠলো—গতকাল ঝড়ে নিশ্চয়ই এরা নৌকা বা জাহাজ ডুবি হয়ে ডুবে গিয়েছিলো। দেখি এরা জীবিত আছে না মরে গেছে...জেলেটা প্রথমে পুরুষটার বুকে মাথা রেখে আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো—বেঁচে আছে এখনও। উঠে এবার মেয়েটাকে পরীক্ষা করে দেখলো—দু'জনাই জীবিত আছে...

সবাই আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো—হুররে...

জেলে সর্দার বললো—তোমরা হাঁ করে কি দেখছো এদের ঘরে নিয়ে চলো। তাড়াতাড়ি ওষুধ খাওয়াতে হবে।

একজন জেলে বললো—সর্দার ওরা বুঝি স্বামী স্ত্রী?

সর্দার বললো—হাঁ তাই হবে। না হলে এরা এক সঙ্গে এমনভাবে থাকবে কেনো।

আসলে পুরুষটি হলো স্বয়ং দস্যু বনহুর আর মেয়েটি হলো মিস হুসনা। তারা যখন সাগর বুকে সাইক্লোনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলো তখন উত্তাল তরঙ্গে হুসনার শাড়ির আঁচলখানা জড়িয়ে গিয়েছিলো বনহুরের দেহের অপর অংশ এটে বাঁধাছিলো হুসনার কোমরে। যে মুহূর্তে হুসনা দড়ি বেয়ে জাহাজের নিচে নামতে যাচ্ছিলো ঐ মুহূর্তে সে কাপড়খানা মাজায় গিঁট দিয়ে পরে নিয়েছিলো। তাই প্রচণ্ড ঝড়েও কাপড়খানা হুসনার কোমর থেকে খসে যায়নি।

বনহুর যখন প্রচন্ড ঢেউ এর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিলো তখন তার এক হাতে ধরাছিলো লাইফ বোট আর অপর হাতে ধরাছিলো হুসনার দেহখানা। কখন যে কিভাবে বনহুর আর হুসনা প্রচণ্ড ঢেউ এর আঘাতে বালুচরে আটকা পড়ে গিয়েছিলো জানেনা তারা নিজেরা কেউ।

জেলেরা বনহুর আর হুসনাকে বাড়ি নিয়ে যায়। তারা নানা রকম গাছ গাছড়ার রস দিয়ে ঔষধ তৈরি করে খাওয়ায়।

সমস্ত দিন সংজ্ঞা ফিরে আসেনা বনহুর এবং হুসনার।

জেলেরা প্রাণপণ সেবা যত্ন করে চলে।

এক সময় জ্ঞান ফিরে আসে হুসনার। তখনও বনহুরের সংজ্ঞা লাভ ঘটেনি।

হুসনা চোখ মেলতেই একটা বৃদ্ধা বলে উঠে—শুয়ে থাক বেটি শুয়ে থাক্! তোর স্বামী ভাল আছে...

হুসনা বিস্মিত হয়, কিন্তু সে এতো বেশি অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো যার জন্য বেশিক্ষণ চোখ মেলে থাকতে পারে না। চোখ বন্ধ করে ভাবে কি হয়েছে তার...এখন যেখানে সে শুয়ে আছে এটা কোন জায়গা—এরাই বা কে...আর তার স্বামী...কে তার স্বামী...ধীরে ধীরে মনে পড়ে সেই ভীষণ ঝড়ের কথা। সেই জলদস্যুদের জাহাজের কথা। মনে পড়ে মনির চৌধুরীর কথা। হঠাৎ বুকটা মোচড় দিয়ে উঠে মনির চৌধুরী কি তার কাছে থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে...

এমন সময় বৃদ্ধা এক গেলাস গরম দুধ এনে বলে—নে দুধ টুকু খেয়ে নে!

হুসনা কোন আপত্তি করতে পারলোনা, ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করে দুধ টুকু খেয়ে নিলো।

বৃদ্ধা আবার ওকে শুইয়ে দিয়ে বললো—চুপ করে শুয়ে থাক। দেখি তোর স্বামীর জ্ঞান ফিরলো কিনা।

চমকে উঠলো আবার হুসনা, অস্ফুট কণ্ঠে বললো—আমার স্বামী। কে আমার স্বামী?

কোনো তোর সঙ্গে যে ছিলো? ঐ তো ও পাশের বিছানায় শুয়ে আছে। দেখবি তোর স্বামীকে?

হুসনা কিছু না বলে মাথা উঁচু করে তাকালো যে দিকে বৃদ্ধা আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো সেই দিকে। সঙ্গে সঙ্গে হুসনার মুখখানা দীপ্ত উজ্বল হয়ে উঠলো। একি এ যে মিঃ চৌধুরী। তবে কি সেও বেঁচে আছে। হুসনা ভুলে যায় সেও অসুস্থ, উঠে পড়ে সে বৃদ্ধার কথা না শুনে।

ও পাশের একটা দড়ির খাটিয়ায় চীৎভাবে শুইয়ে রাখা হয়েছে বনহুরকে। জামাটা খুলে ফেলেছে ওরা তার দেহ থেকে। শুধু প্যান্টখানা পরা আছে। পায়েও কোন জুতো বা মুজো নাই।

হুসনা এসে দাঁড়ায় ঘাটিয়ার পাশে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে ওর সংজ্ঞাহীন মুখমন্ডলের দিকে।

বৃদ্ধা এসে দাঁড়িয়েছে হুসনার পিছনে, ওর কাঁধে হাত রেখে সান্তনার স্বরে বলে—দুঃখ করিস না মেয়ে। তোর স্বামী মরবেনা বেঁচে যাবে...

এতো দুঃখেও হুসনার বুকটা আনন্দে আলোড়িত হয়ে উঠে। দীপ্ত উজ্জল হয়ে উঠে তার মুখখানা। সত্যি কি তার ভাগ্য এমন হবে? মিঃ চৌধুরীকে স্বামীরূপে কল্পনা করাও যে তার পাপ, কারণ সে সতীত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু যদি সে তাকে ভালই না বাসবে তবে কেনো সে জীবন দিয়ে তাকে উদ্ধার করলো? একটা অনাবিল খুশির উৎস তার শিরায় শিরায় শিহরণ জাগালো। যদিও তার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তবু আনন্দে উদ্ভাসিত তার হৃদয়।

বৃদ্ধা বললো—তোর স্বামী বেঁচে আছে দেখে খুব খুশি হয়েছিস মেয়ে তাই না?

হুসনা বললো—হাঁ। অনেক খুশি হয়েছি আমি।

জানিস মেয়ে তোর স্বামী তোর আঁচলখানা শক্ত করে গায়ে পরিয়ে নিয়ে ছিলো যেনো তুই হারিয়ে না যাস্ তাই তো তোরা এক সঙ্গে ছিলি। না হলে কোথায় ভেসে যেতিস কেউ কাউকে খুঁজে পেতিস না আর।

বুড়ি মা ও বাঁচবে তো?

হাঁ বাঁচবে। ওকে অনেক ওষুধ খাইয়েছি। মরবেনা আর ও মেয়ে তুই একটু ওর পাশে বস আমি দেখি ওদিকে আবার আমার সব কাজ পড়ে আছে।

আচ্ছা তুমি যাও বুড়িমা, আমি বসছি।

তোর শরীর খারাপ কিনা...

না খারাপ লাগছে না। যদিও হুসনার কথাটা সত্য নয় তবু সে বললো।

বৃদ্ধা বেরিয়ে গেলো।

হুসনা বসলো বনহুরের পাশে। এমন ভাবে হুসনা ওকে দেখেনি কোন সময়। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো; তারপর ধীরে ধীরে ওর মাথায় কপালে চিবুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো হুসনা।

এমন সময় ফিরে এলো বৃদ্ধা পিছনে ওর স্বামী বৃদ্ধ জেলে। হাতে এক বাটি ঔষধ হুসনা রং দেখে বুঝতে পারলো গাছ গাছড়ার রস হবে।

হুসনাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে বৃদ্ধ খুশি হলো, বললো—মেয়ে তুই এরি মধ্যে ভাল হয়ে গেছিস?

হুসনা বললো—হাঁ বাবা আমি ভাল হয়ে গেছি। কিন্তু ওর যে এখনও জ্ঞান ফিরে এলো না?

কিছু ভাবিস না মেয়ে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু একটু দেরী হবে কারণ কি জানিস মেয়ে? ও খুব পরিশ্রম করে তোকে বাঁচিয়েছে। তুফান বড় খারাপ বুঝলি?

হুসনা বুঝতে পারে মিঃ চৌধুরী তাকে বাঁচানোর জন্যই অনেক চেষ্টা করেছে। সাইক্লোনের সঙ্গে লড়াই করেছে তবেই তাকে বাঁচাতে পেরেছে...কিন্তু কি হলো তার জীবন রক্ষা করে। এই অপবিত্র জীবন নিয়ে এমন দেব সমতুল্য পবিত্র একটি জীবন নষ্ট করবে সে কি করে।...

কি ভাবছিস মেয়ে? যা তুই বিশ্রাম করবি যা আমি ওকে এই রস খাইয়ে দিবো। দেখবি এক ঘন্টার মধ্যে ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। জানিস মেয়ে আমরা সাগরের মানুষ—সাগরের সঙ্গে আমাদের যেমন শত্রুতা তেমনি মিতালীও আছে। এই রস দেখছিস এ রস সাগরের নিচে এক রকম গাছ গাছড়া আছে তারই। আমি নিজে গিয়ে তুলে এনেছি। ওকে খাইয়ে দিলে সব ভাল হয়ে যাবে।

হুসনা দু'চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধার মুখে। এই নিঃসঙ্গ অজানা অচেনা জায়গায় এরা তাদের কেউ নয় তবু এরাই যে তাদের পরম আপন জন। হুসনা গিয়ে নিজের বিছানায় বসে।

বিছানা বলতে দড়ির খাটিয়ায় একটি কম্বল বিছানো আর একটি তেলচিটা বালিশ। দড়ির খাটিয়ায় বসে বসে ভাবে হুসনা, কোন দিন যে তার পিতা মাতা ভাইবোনদের কাছে ফিরে যেতে পারবে কিনা কে জানে। হয়তো তার আব্বা কত ভাবছে, মা হয়তো কত কাঁদছে, ভাইবোনরা না জানি কত চিন্তা করছে.....আজ সে কোথায়, কোন অজানা দেশে। তবু তার বুকে ভরসা মিঃ চৌধুরী আছেন তার সঙ্গে। যদি কোন দিন সে ফিরে যেতে নাও পারে তবু যদি পাশে থাকে মিঃ চৌধুরী।

হঠাৎ বৃদ্ধার আনন্দ ধ্বনি শোনা যায় মেয়ে এদিকে আয় তোর স্বামী চোখ মেলেছে। এদিকে আয়.....

হুসনা তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে যায়, বনহুরের খাটিয়া খানার পাশে।

সত্যি বনহুর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাতে চেষ্টা করছে।

বৃদ্ধা জেলে বলে উঠে—দেখলি মেয়ে আমার ওষুধের গুণ দেখলি? খাইয়ে দিতে না দিতেই কেমন হুস হয়ে গেলো।

বনহুরের তখনও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা ফিরে পায়নি, পাশ ফিরে আবার সে চোখ বন্ধ করলো।

বৃদ্ধ বললো—তুই ওর পাশে বসে থাক মেয়ে যতক্ষণ হুস না হবে ততক্ষণ সরবিনা।

আচ্ছা তাই থাকছি। বললো হুসনা।

❑

কয়েক ঘন্টা অঘোরে ঘুমালো বনহুর।

হুসনা সব সময় জেগে বসে রইলো তার শিয়রে। মাঝে মাঝে চুলে কপালে গন্ডে হাতখানা বুলিয়ে দিতে লাগলো। এমন করে সে তো এর পূর্বে কোন দিন ওকে স্পর্শ করার সুযোগ পায়নি। মনে ওর বিপুল উন্মাদনা, আর উজ্জ্বল আনন্দ ওর কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগলো সে আলগোছে।

হঠাৎ হুসনার একটু তন্দ্রার মত এসেছে এমন সময় বনহুর বলে উঠে—একটু পানি। মনিরা একটু পানি দাও.....

হুসনা তাড়াতাড়ি ঝুকে পড়ে বনহুরের মুখের উপর—মিঃ চৌধুরী... মিঃ চৌধুরী.....ও পাশ থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে তুলে ধরে বনহুরকে—নিন পানি খান।

বনহুর পানি খেলো কিন্তু চোখ মেললোনা বা কোন কথা বললোনা।

সমস্ত রাত সংজ্ঞা ফিরে এলোনা বনহুরের।

হুসনা অত্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন ছিলো তাই সে নিজেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারলো না। এক সময় বনহুরের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধ এসে দেখে গেলো ওরা ঘুমিয়ে আছে। তাই ওরা বিরক্ত করলো না, বেরিয়ে গেলো দরজার ঝাপ বন্ধ করে।

জেলেদের ঘরদোর সব বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি ছিলো। দরজা বলতে ওদের তেমন কিছু নয় সামান্য মাপ দিয়ে তৈরি একটি ঢাকনা।

জেলেদের তেমন ঘর দরজার প্রয়োজনই বা কি? সমস্ত দিন ওরা ডিংগি নৌকা আর জাল নিয়ে সমুদ্রে পড়ে থাকে। ফিরে আসে সন্ধ্যার পর রাত টুকু ওরা কাটায় তারপর আবার সকালে সেই জাল নৌকা আর সমুদ্র।

ঘর সংসার বলতে ওদের খুব বড় একটা কিছু নেই। দু'চারটে হাড়ি পাতিল আর মাটির থালা বাসন।

কেউ কেউ মাটির মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে শোয়, কেউ বা দড়ির খাটিয়ায়। তবে সবার ঘরে দড়ির খাটিয়া নাই। জেলে সর্দার খসরুর ঘরে দুটো খাটিয়া ছিলো। একটাতে খসরু নিজে শুতো একটাতে বুড়ি। কিন্তু দুটো ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ে সমুদ্রে ভেসে এসেছে তাই ওরা দড়ির খাটিয়া দুটো ছেড়ে দিয়েছে দু'জনাকে। ওরা অবশ্য পাশের ঘরে মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে শোয়।

কষ্ট ওদের হয় না, কারণ এ-সব গা সওয়া হয়ে গেছে।

সকালে হুসনার ঘুম ভাংবার পূর্বেই সংজ্ঞা ফিরে আসে বনহুরের। সে ধীরে ধীরে চোখ মেলো তাকায়। বুড়ো জেলের দেওয়া সমুদ্র তলের উদ্ভিদের রস খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে বনহুর। তারপর একটানা ঘুম পেয়ে এখন আর কোন ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। সুস্থভাবে তাকায় সে, হঠাৎ নজর পড়ে তার নিজের খাটিয়ার পাশে কে যেন শুয়ে আছে। বিস্মিতভাবে উঠে বসতেই হুসনার মুখে নজর পড়ে। একি হুসনা তার পাশে শোয়া.....তাছাড়া দড়ির খাটিয়া.....বেড়ার ঘর .....ঘরের চালা.....এ সে কোথায়.....কি করে সে এখানে এলো? বনহুর খাটিয়ায় সোজা হয়ে বসে, তার নিজের দেহের দিকে তাকায়, এমন খালি গা কেনো তার।

ভ্রুকুঞ্চিত করে ভাবতে থাকে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে সব কথা। জলদস্যুদের জাহাজ.....সাইক্লোন .....প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউ.....মেঘের গর্জনের মত ভয়ঙ্কর শব্দ.....তারপর সমুদ্র বক্ষে লাইফবোট.....হুসনাকে নিয়ে প্রাণ পনে ভেসে থাকার চেষ্টা.....বনহুরের চোখ দুটো নেমে আসে হুসনার মুখে, কি করে সে এবং হুসনা বেঁচে আছে এবং একই সঙ্গে আছে ভেবে পায় না!

হুসনা অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর খাটিয়া থেকে নেমে দাঁড়ায় নিচে। এগিয়ে চলে দরজার দিকে। ঝাপ সরিয়ে বেরিয়ে আসতেই বৃদ্ধ জেলে আর জেলে বুড়ি আনন্দে উচ্ছল হয়ে এগিয়ে আসে। বুড়োবুড়িকে লক্ষ্য করে বলে— দেখলে আমি বলেছিলাম—ঐ ওষুধ খেলে এক ঘুমে বাবু সেরে উঠবে। দেখিল তো সত্যি কিনা? বাবু এখন কেমন লাগছে তোর?

বনহুর কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো বুড়ো জেলের মুখে, ওর কথাগুলো শুনছিলো সে মনোযোগ সহকারে। অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো এই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাদের জীবন রক্ষা। নিশ্চয়ই এরা তাদের কোন রকমে উদ্ধার করে এনেছে।

বনহুর বললো—এখন বেশ ভাল লাগছে।

বৃদ্ধা বলে উঠে—বাবু বৌ এর বুঝি ঘুম ভাংগেনি?

বনহুর মনে মনে বললো—বৌ-কে বৌ-কার কথা বলছে এরা পরক্ষণেই বুঝতে পারলো এরা হুসনাকে তার বৌ বলে মনে করে নিয়েছে। এতো দুঃখেও হাসি পেলো বনহুরের, বললো—না ওর ঘুম ভাংগেনি।

অল্পক্ষণেই তার চার পাশে এসে জড়ো হলো অনেক জেলে পরিবার তাদের বৌ-ছেলে মেয়ে সবাই তাকে ঘিরে ধরে অবাক হয়ে দেখছে।

বৃদ্ধা বললো—তোরা বাবুর কি দেখছিস যা যা ভাগ সবাই।

বৃদ্ধ ও স্ত্রীর কথায় যোগ দিয়ে বললো—হা করে কি দেখছিস সব। যা বাবুর জন্য খাবার নিয়ে আয়।

একজন বললো—বাবুকে আমরা দেখতে এসেছি।

অপর একজন বললো—বাবু এখন সেরে গেছে?

বৃদ্ধা বললো—সারবেনা আমার ওষুধ কম মনে করেছিস। মরা মানুষ জ্যান্ত হয় বুঝলি?

বৃদ্ধা বলে—বুড়ো তুই গাই দুয়ে দে বাবুকে দুধ গরম করে দিবো।

হাঁ তাই কর। হাঁড়ি নিয়ে যায়.....ওরে হাল্লু গাই নিয়ে আয় বাছুর নিয়ে আয়.....

বনহুর পুনরায় ফিরে যায় কুঠিরের মধ্যে।

তখনও হুসনা ঘুমাচ্ছে।

বনহুর একটু হাসে, বৃদ্ধার কথাটা ওর কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—বাবু বৌ-এর ঘুম ভাংগেনি বুঝি? বৌ—ওরা মনে করেছে হুসনা বৌ, দোষ কি ওদের। ওরা তো আর জানেনা কে সে আর মেয়েটাই বা কে। বনহুর হুসনার কানের কাছে ঝুকে ডাক দেয়—মিস হুসনা। মিস হুসনা!

হুসনা চোখ মেলে তাকিয়েই বনহুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠে আনন্দে ঝলমল করে উঠে ওর চোখ দুটো। সোজা হয়ে বসে অসংযত কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে বলে—কেমন আছেন মিঃ চৌধুরী?

বনহুর হুসনার পাশে বসে বলে—দেখতেই পাচ্ছেন সম্পূর্ণ সুস্থ।

হুসনা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় তারপর—বলে আপনার জন্য বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। যাক এবার জামাটা পরে ফেলুন দেখি। হুসনা ওদিকের দড়িতে বিছিয়ে রাখা জামাটা এনে বনহুরের হাতে দেয়।

বনহুর বুঝতে পারে তার দেহ থেকে জামাটা খুলে শুকোতে দেওয়া হয়েছিলো। জামাটা হাতে নিয়ে পরতে থাকে।

জামাটা পরা শেষ করে বলে বনহুর—মিস হুসনা, এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা বেঁচে আছি কি করে? এবং দু'জন এক সঙ্গেই আছি.....

হুসনার মুখে একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে বলে সে—ঠিক আমিও বুঝতে পারিনি মিঃ চৌধুরী। তবে এদের কথা বার্তায় বোঝা যায় আমার

শাড়িখানা আপনার দেহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো এবং সেই অবস্থাতে এরা আমাদের দু'জনাকে সমুদ্র তীরে কুড়িয়ে পায়।

হাঁ বাবু, মেয়ে যা বললো তাই ঠিক। আমরা তোকে এবং বৌকে সমুদ্র তীরে কুড়িয়ে পেয়েছি। তোদের দেখে বাড়ি নিয়ে এসেছি। তোদের কষ্ট হচ্ছে বাবু? কথাগুলো এক সঙ্গে বললো বৃদ্ধ জেলে খসরু।

বনহুর হেসে বললো—বুড়ো বাবা আমরা খুব ভাল আছি। তুমি আমাদের বাড়ি বয়ে না আনলে আমরা নিশ্চয়ই মরে যেতাম।

এমন সময় জেলে বুড়ি দু'বাটি গরম দুধ এনে খেতে দেয়; বাবু আর হুসনাকে। বলে—নে বাবু তুই আর বৌ খেয়ে নে।

বনহুর দুধের বাটিটা হাতে তুলে নিয়ে মৃদু হেসে বলে—বৌ নাও।

হুসনা বৃদ্ধার কথা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিলো এবার সে আরও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

জেলে বুড়ি বলে—লজ্জা করছিস মেয়ে। তোরা খা, আমরা যাচ্ছি। বুড়োকে লক্ষ্য করে বলে—আয় আমরা যাই।

চল বুড়ি চল ওরা খাক।

বেরিয়ে যায় জেলে বুড়ি আর বুড়ো।

বনহুর হেসে বলে—মিস হুসনা ওরা অবুঝ সরল মানুষ তাই ভুল করেছে। আমি ওদের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

হুসনার গন্ড রক্তাভ হয়ে উঠে, লজ্জায় মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায় সে।

❑

বনহুর একদিন বলে—বুড়ো বাবা এমন করে বসে বসে আর কতদিন খাবো—একটা জাল দাও তোমাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবো।

জেলে আর জেলে বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ে। অবাক হয়ে বলে জেলে বুড়ো খসরু—বাবু এ তুই কি বলছিস মাছ ধরতে যাবি আমাদের সঙ্গে?

হাঁ বুড়ো বাবা। বলে বনহুর।

বুড়ি বুড়ো এক সঙ্গে বলে উঠে—না তা হবে না।

বনহুর বলে—কেনো? কেনো হবে না?

এ সব কাজ কি তোরা করেছিস কোনদিন যে পারবি। আমরা থাকতে তোকে আর বৌকে কিছু ভাবতে হবে না। মাছ মারি কোন তো অভাব নাই আমাদের। কথাগুলো বলে হাসে জেলে বুড়ো তারপর আবার বলে—আমাদের ছেলে মেয়ে কিছু নাই। যা কামাই করি পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে মিলে মিশে খাই। না হয় তোরা খেলি? বলে চলে যায় বুড়ো এবং বুড়ি।

হুসনাও শুনছিলো ওদের কথাগুলো।

বনহুর তাকালো হুসনার দিকে, বললো—দেখলেন গরিব হলেও এরা কত মহৎ। কত বড় উদার এদের মন।

কিন্তু পারে না বনহুর এমন করে চুপ চাপ সময় কাটাতে। প্রতিদিন সকাল এবং বৈকাল সমুদ্রের ধারে দিয়ে বালুচরে বসে বসে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ যদি কোন জাহাজ এসে পড়ে এদিকে, তাহলে হয় তো তারা ফিরে যেতে পারত—না হলে এখান থেকে ফিরে যাবার কোন উপায় নাই। বনহুর কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পেরেছে—যেখানে তারা এখন আছে সেটা একটা অজানা অচেনা দ্বীপ। এ দ্বীপের নাম কুন্দল দ্বীপ।

এ দ্বীপে সভ্য মানুষ না থাকলেও জেলেরা আছে এরা কিছুটা সভ্য। আর অন্যান্য কিছু লোক বাস করে এরা সম্পূর্ণ অসভ্য ধরণের। এরা সভ্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে জানে না। এরা অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়ংকর।

একদিন বনহুর জেলে বুড়োর কাছে এদের গল্প শুনেছে। এরা এ দ্বীপের পূর্ব দিক অধিকার করে নিয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ আচমকা ওরা

এসে জেলেদের উপর আক্রমণ চালায় তখন যুদ্ধ হয়। জেলেরাও কম সাহসী নয়। তারাও অসভ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। হতাহত হয় উভয় পক্ষে।

এসব এদের গা সওয়া তাই এরা এ সব নিয়ে তেমন করে মাথা ঘামায় না। মাছ ধরে জমি আছে ফসল বোনে, খায় ঘুমায় এই এদের কাজ।

এ দ্বীপে কোন জাহাজ আসে না তাই এরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে পরিচিত নয়। অবশ্য এ দ্বীপে জাহাজ না আসার কারণ আছে, জেলে বুড়োর কাছেই বনহুর জেনে নিয়েছে। এ দ্বীপের চারদিকে নাকি বহু ডুবো ছোট ছোট পর্বত বা ডুবো দ্বীপ আছে। জাহাজ এলে এ সব পর্বতে ধাক্কা খেয়ে তলা ফেঁসে যায় এবং জাহাজ ডুবি হয়ে লোক মারা যায়। কাজেই এদিকে কোন জাহাজ ভুলক্রমেও আসে না।

কথাটা শুনে বনহুর শিউরে উঠেছিলো মনে মনে কিন্তু হুসনাকে এ কথা সে বলেনি কারণ সে হয়তো এ কথা শুনলে অত্যন্ত মুষড়ে পড়বে। বুঝতে পারবে কোন দিন আর সে ফিরে যেতে পারবে না তার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনের কাছে। বনহুর নিজেও হতাশ হয়ে পড়েছিলো। তবু সে একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে বসে থাকতো সকাল বিকাল সমুদ্রতীরে এছাড়া আর কিইবা করবার ছিলো তার।

প্রায় সপ্তাহ কেটে গেলো।

ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠছে বনহুর।

হুসনাকে দেখলে কিন্তু তেমন ভাবাপন্ন মনে হয় না বরং সে দিন দিন আনন্দ মুখর হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে ভাবে হুসনা এমনি করে চিরদিন যদি মিঃ চৌধুরীকে সে নিজের পাশে পেতো তা হলে ধন্য হবে তার জীবন। পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ যেন এসে জড়ো হয়ে আছে মিঃ চৌধুরীর মধ্যে। ওর সান্নিধ্য হুসনার জীবনে এক পরম সম্পদ।

বনহুর বুঝতে পারে দিন দিন হুসনা তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। তাকে নিবিড় করে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে সে। যতই বনহুর এড়িয়ে চলুক

হুসনা তাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে। অবশ্য এর জন্য দায়ী বনহুর নিজে নয়। ভাগ্য তাদের এভাবে উভয়কে কঠিন এক সমস্যার সম্মুখে এগিয়ে নিচ্ছে।

কাজ না করে সময় কাটে না।

বনহুর একদিন জেলেদের সঙ্গে জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বুড়ো জেলে বা বুড়িমার কথা সে কানেও নিলোনা। বনহুর চায় নিজের মনকে সংযত রাখতে এবং কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে।

হুসনা তো অবাক, সে বলেই বসে—মিঃ চৌধুরী আপনি মাছ ধরতে পারবেন?

কেনো পারবো না। মানুষ যা পারে তা আমিও পারি। জালটা গুছিয়ে নিতে নিতে বললো বনহুর।

হুসনা বললো—আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন না?

অবাক হয়ে বলে বনহুর—আপনি যাবেন মাছ ধরতে?

হাঁ, ঐ তো জেলে মেয়েরা যাচ্ছে?

ওদের অভ্যাস আছে।

আমিও অভ্যাস করে নেবো।

তা হয় না আপনি এসব পারবেন না।

মিঃ চৌধুরী আপনি চলে গেলে কি করে একা থাকবো?

হাসলো বনহুর একটু ভেবে বললো—আপনি সমুদ্র তীরে ঝিনুক কুড়োতে থাকুন কেমন?

আচ্ছা।

বনহুর জেলেদের সঙ্গে চলে যায়।

হুসনা সমুদ্র তীরে বেলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে সম্মুখের দিকে। যতক্ষণ বনহুরকে দেখা যায় ততক্ষণ নির্নিমেশ দৃষ্টি নিয়ে দেখতে থাকে।

একদল জেলের মধ্যে বনহুর যেন অপরূপ এক পুরুষ। বনহুরের দেহে কোন জামা ছিলো না তাই ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

জেলেদের নৌকাগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই হুসনা সুমুদ্র তীর বেয়ে অগ্রসর হলো। দেখতে পেলো সুন্দর সুন্দর ঝিনুক পড়ে আছে এখানে সেখানে। হুসনা ঝিনুকগুলো কুড়িয়ে আঁচলে জড়ো করতে লাগলো।

অল্পক্ষণে সে অনেক ঝিনুক সংগ্রহ করে ফেললো। এমন সময় জেলেদের একটি তরুণী এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে, বললো—কি করবি ও সব ঝিনুক দিয়ে?

হুসনা হেসে বললে—খেলা করবো।

কার সঙ্গে ? স্বামীর সঙ্গে বুঝি?

হুসনা চট করে জবাব দিতে পারলো না, সে মাথা নিচু করে রইলো।

তরুণীটি বললো—লজ্জা করছে না? আমরা কিন্তু স্বামীকে দেখে এতো লজ্জা করি না। আমার স্বামীকে তুই দেখেছিস?

না।

তোর স্বামীর মত এতো সুন্দর না—কালো। কিন্তু জানিস আমার স্বামী আমাকে খুব ভালবাসে। তোর স্বামী তোকে আদর করে না?

হুসনা ছোট্ট জরে জবাব দেয়—করে।

তোর নাম কি?

হুসনা।

আমার নাম চুমকি। আয় ঘরে যাই চল।

হুসনা আর চুমকি ফিরে চলে।

যেতে যেতে অনেক গল্প করে চুমকি—হুসনা শোনে। বলে চুমকি এই দেখ হুসনা আমার স্বামী আমাকে কত চুড়ি এনে দিয়েছে। জানিস এখানে মেলা হয়। মেলাতে অনেক কিছু পাওয়া যায়। মাথার ফিতা, চুড়ি, নাকের নোলক, দুল সব পাওয়া যায়। তুই তোর স্বামীকে বলিস মেলায় তোকে নিয়ে যাবে।

হুসনা শুধু শুনে যায় কোন কথা বলেনা। তবে বড় ভাল লাগে ওর কথাগুলো হুসনার। মনপ্রাণ দিয়ে ও অনুভব করে।

এক সময় ফিরে আসে জেলেরা।

উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করছিলো হুসনা মিঃ চৌধুরীর।

ফিরে আসে বনহুর।

জেলেরা আজ অনেক মাছ পেয়েছে। খুশিতে ডগমগ সবাই। বুড়ো জেলে বললো—বাবুর বড় সাঁত আছে তাই আজ এতো মাছ পেয়েছি।

সবাই যখন মাছ ভাগ করা নিয়ে ব্যস্ত তখন বনহুর নিজের কুঠির মধ্যে এসে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ে দড়ির খাটিয়ায়। ক্লান্ত-অবশ দেহটা এলিয়ে দিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে কত কথা। অবসর মুহূর্তে সিগারেট বনহুরের একমাত্র সাথী কিন্তু এ দেশে সিগারেট-বা ঐ ধরনের কিছু নেই। জেলেরা গাঁজা খায়, তাড়ি খায় নেশা করে এ সব তো আর বনহুরের জন্য নয়।

সিগারেট না পেলে বনহুরের মাথা ধরে এটা তার অভ্যাস কিন্তু না পেলেও সে একেবারে অস্থির বা ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়েনা।

বনহুর নির্জনে চোখ বন্ধ করে পড়েছিলো।

হুসনা এসে বসে তার শিয়রে কিছুক্ষণ এক নজরে তাকিয়ে থাকে সে তার মুখমন্ডলে। তারপর একটা হাত পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকে।

বনহুর বুঝতে পারে হুসনা ছাড়া কেউ নয়। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় শান্ত কণ্ঠে বলে মিস হুসনা আপনি আমার জন্য অনেক কষ্ট করেন কিন্তু আমি আপনার কিছু করতে পারলামনা।

হুসনা বলে উঠে—আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন আর বলছেন কিছু করতে পারেননি?

জীবন রক্ষা ঠিক আমি করেছি বলে মনে হয়না।

আপনি স্বীকার না করলেও আমি তো অস্বীকার করতে পারবোনা। আপনি যদি সেই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে সাগর বক্ষে সাঁতার না দিতেন তাহলে কিছুতেই আজ পৃথিবীর আলো দেখতে পেতাম না। সেই ভীষণ

মুহূর্তের কথা কোন দিনই ভুলবোনা মিঃ চৌধুরী। চিরদিন স্মরণ থাকবে সেদিনের কথা।

এরপর থেকে প্রতিদিন বনহুর জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে সমুদ্রে যেতো। হাঁপিয়ে উঠা মুহূর্তগুলো হারিয়ে যেতো কাজের মধ্যে কিন্তু যেদিন জেলেরা মাছ ধরতে যেতোনা সেদিন বড় খারাপ লাগতো। তবে সেদিনের সাথী ছিলো হুসনা। যদিও বনহুর হুসনাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো তবু মাঝে মাঝে ওকে কাছে পাবার জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কারণ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা তাকে অস্থির করে তুলতো।

সমুদ্রের ধারে বেলাভূমিতে বনহুর আর হুসনা বসে নানা গল্প করতো। হুসনা তার ছোটবেলার কাহিনী বলে শোনাতো। বনহুর সত্য গোপন করে যতটুকু বলা যায় বলতো ওর কাছে।

কখনও ওরা দু'জন মিলে ঝিনুক কুড়োতো, ছোট্ট ছেলে মেয়েদের মত খেলা করতো ওরা ঝিনুক নিয়ে। কোন সময় সমুদ্রের উচ্ছল ফেনিল ঢেউগুলোর মধ্যে ছু'টোছুটি করতো। একদিন হুসনা একটা বড় সুন্দর ঝিনুক দেখে বললো—মিঃ চৌধুরী দেখছেন কি সুন্দর একটা ঝিনুক, ওটা কে আগে নিতে পারে আপনি না আমি।

বেশ তাই হোক! বললো বনহুর তারপ. হুসনা আর বনহুর এক সঙ্গে দিলো দৌড়।

বনহুর আর হুসনা একসঙ্গে ধরে ফেললো ঝিনুকটা। দু'জন হেসে উঠলো ওরা খিলখিল করে।

হুসনা বললো—আমি আগে ধরেছি।

বনহুর বললো—আমি আগে ধরেছি।

এমন সময় চুমকি এসে দাঁড়ালো, সেও হাসছে। বললো—কি হয়েছে বাবু?

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো—দেখো চুমকি, ঝিনুকটা আমি আগে ধরেছি কিন্তু হুসনা স্বীকার করছে না ও বলছে আমি ধরেছি।:

হুসনা বললো—মিথ্যে কথা আমি ধরেছি।

বনহুর বললো—আচ্ছা এবার চুমকিকে স্বাক্ষী রেখে আমরা ঝিনুক ধরবো।

বেশ্ তাই হোক। হুসনা রাজি হয়ে গেলো।

চুমকি নিজে গিয়ে ঝিনুকটা বালির উপরে রেখে এলো, বললো—দেখবো তোরা কে আগে এটা ধরতে পারিস!

বনহুর তৈরি হয়ে দাঁড়ালো, হুসনাও মাজায় কাপড় জড়িয়ে নিলো ভাল করে।

চুমকি হাতে হালি দিলো একটা, দুটো , তিনটা। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলো বনহুর আর হুসনা।

এবার বনহুর আগে ধরে ফেললো ঝিনুকটা।

সঙ্গে সঙ্গে হুসনাও ধরে ফেললো কিন্তু ঝিনুক নয় বনহুরের হাতখানাকে দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরলো সে।

চুমকি খিল খিল করে হেসে উঠলো।

হুসনার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, হেরে যাওয়ার লজ্জায় সে ম্লান হয়ে পড়লো বিশেষ করে চুমকির সামনে।

বনহুরও হাসতে লাগলো।

হুসনার অভিমান হয়ে গেলো।

বনহুর বুঝতে পারলো হুসনা হেরে যাওয়ায় অভিমান করে বসেছে তাই সে এগিয়ে এসে হুসনার চিবুকটা তুলে ধরে বলে—নিন আর একবার হোক। চুমকী তুমি এবার ভাল করে দেখবে কেমন?

আচ্ছা বাবু।

বনহুর ঝিনুকটা ছুড়ে কিছু দূরে ফেলে দিয়ে বলে—নিন এবার কে আগে ঝিনুকটা হাতে তুলে নিতে পারে।

না আমি আর নেবো না।

রাগ করলেন?

না।

তবে?

আর নেবো না।

আর একবার।

যদি আমি জিতে যাই তাহলে কাল আপনি যখন মাছ ধরতে যাবেন আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। যদি কথা দেন তাহলে রাজি আছি।

আচ্ছা কথা দিলাম। বললো বনহুর।

হুসনা চুমকীকে লক্ষ্য করে বললো—চুমকী তুমি সাক্ষী রইলে যদি জিতে যাই তাহলে কাল কিন্তু আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে।

চুমকী বললো—হাঁ বাবু ঠিক তোকে নিয়ে যাবে। এবার সে হাতে তালি দিলো, একবার দু'বার, তিনবার।

সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিলো হুসনা।

বনহুর একটু পিছিয়ে ধীরে দৌড় দিলো।

হুসনাকে জিতে দেওয়াটাই ছিলো বনহুরের মূল উদ্দেশ্য।

হুসনা খুশি হয়ে উঠলো।

এমনি করে নানা হাসি গল্পে এবং দৌড়াদৌড়িতে কাটতে লাগলো দিনগুলো। আজকাল হুসনাও যায় মাছ ধরতে জেলেদের সঙ্গে।

সমুদ্রে জাল নিয়ে মাছ ধরতে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠে হুসনা। সর্বক্ষণ হুসনা চায় মিঃ চৌধুরীকে তার কাছে কাছে রাখতে।

হুসনার তাই ছলনা কেমন করে মাছ ধরার মুহূর্তগুলোও সে মিঃ চৌধুরীর পাশে পাশে থাকতে পারবে এবং সে কারণেই কৌশলে হুসনা মিঃ চৌধুরীকে সেদিন শপথ করিয়ে নিয়েছে।

এখন সে ইচ্ছামত মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে সমুদ্রে যায়। মিঃ চৌধুরী তাকে বাধা দেয় না। ভোরে সূর্য উঠা দেখতে ভালবাসে হুসনা তাই সে রোজ খুব সকালে সমুদ্র তীরে গিয়ে বসে মিঃ চৌধুরীকে তার পাশে চাই।

বনহুর হুসনার আনন্দে বাধা দেয়না, সেও হাঁপিয়ে উঠা মুহূর্তগুলোকে ভুলে থাকতে চায়। মাঝে মাঝে মনটা বড় অস্থির হয়ে পড়ে, মনে পড়ে আস্তানার কথা, মনে পড়ে নূরী আর জাভেদের কথা, মনে পড়ে মনিরা আর

নূরের কথা। সব চেয়ে মায়ের মুখ খানা মনে পড়লে অসহ্য একটা ব্যথায় টনটন করে উঠে বুকটা।

তখন বনহুর গম্ভীর ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। নির্জনতার সন্ধানে একা একা গিয়ে বসে সমুদ্র তীরে। যেখানে সহসা কারো দৃষ্টি গিয়ে পড়বে না এমন এক জায়গায় বসে তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে।

আকাশের নীল আর সমুদ্রের নীল যেখানে মিশে এক হয়ে গেছে সেখানে স্থির হয় তার দৃষ্টি। কতদিন আর সে এমনি এক নিষ্ঠুর বন্দী জীবন কাটাবে। আকাশে অসংখ্য বলাকা ডানা মেলে ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ নীড়ে কিন্তু সে ফিরে যাবে কোথায়? জেলেরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, স্নেহ করে জেলে বুড়ো জেলে বুড়ি মা। যা খাচ্ছে মোটামুটি মন্দ নয়। প্রচুর ফল না খেলেও প্রচুর দুধ সে পাচ্ছে। কিন্তু এমনি করে কতদিন কাটবে। দু'মাস কেটে গেছে। হুসনা আর জেলেদের নিয়ে সে এতোগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছে। কতদিন হুসনাকে পাশে পেয়ে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে হয়তো বা পুরুষ সুলভ স্বভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে তবু সে বিচলিত বা অসংযত কিছু ঘটিয়ে বসেনি।

কঠিন এক সংযম বন্ধনে নিজকে আটকে রেখেছে। পাশাপাশি দু'টো খাটিয়ায় ঘুমাতো ওরা একই কুঠিরে। জেলেরা জানতো ওরা দু'জন বর-বৌ তাই ওদের মধ্যে তাদের নিয়ে কোন চিন্তার কারণ ছিলোনা। বরং ওদের নিয়ে জেলে জেলেনীদের মধ্যে খুশির উচ্ছাস বইত। প্রায়ই জেলেদের পাড়ায় উৎসব হতো।

বনহুর আর হুসনাকে কেন্দ্র করে জেলে জেলেনীরা নাচ গান তামাসা করতো।

পূর্ণিমা রাতে ওদের সব চেয়ে বড় আনন্দ-উৎসব হতো। গত পূর্ণিমা রাতে অনেক সময় ধরে নাচ-গাচ চলেছিলো। তারপর চলেছিলো ভোজনের পালা। জেলে বুড়ির আদেশক্রমে জেলে তরুণীরা হুসনা আর বনহুরকে

নিজেদের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছিলো। যদিও বনহুর প্রথমে রাজি হচ্ছিলোনা তবু ওরা জোরপূর্বক রাজি করিয়ে ছাড়লো সেদিন। তরুণীরা হুসনা আর বনহুরকে নিয়ে রং মাখামাখি করলো তারপর দু'জনাকে বাসর ঘরে দেবার মত করে পৌঁছে দিয়ে গেলো কুঠিরটার মধ্যে।

কুঠিরে প্রবেশ করে গলা থেকে ফুলের মালাগুলো খুলে দড়ির খাটিয়ার এক পাশে রেখে বলে উঠে—হুসনা এ সবের জন্য আমাকে যেন ভুল বুঝোনা।

হুসনার মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো তখন। কোন জবাব সে দিতে পারেনি কারণ এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁদের দু'জনার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটেছে। যদিও তারা কোন আপত্তি করেনি। করলেও ওরা তা শুনতোনা এ কথা জানে হুসনা এবং বনহুর।

বনহুর মালাগুলো রেখেই দেহটা এলিয়ে দিয়েছিলো খাটিয়ায়। হুসনাও তার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো। রাত গভীর হওয়ায় বেশিক্ষণ হুসনা জেগে থাকতে পারেনি সেদিন।

বনহুর কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারেনি। বেড়ার ফাঁকে আকাশের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছিলো সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলো নানা কথা। জোছনার আলোতে উজ্জল চারিদিক। আকাশে অসংখ্য তারার প্রদীপ আজ নিপ্রভ। চাঁদের আলোতে তারাগুলোকে প্রাণহীন মনে হচ্ছে।

রাত কত হয়েছে বুঝবার কোন উপায় নেই। কারণ এ দ্বীপে আসার পর ঘড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। তাই সময় তাকে আন্দাজে নির্ণয় করে নিতে হয়। বনহুর বুঝতে পারে রাত দুঁটো কিংবা তিনটে হবে। সমুদ্রের ক্ষীণ গর্জন শোনা যাচ্ছে। অজস্র ঢেউ এসে আচড়ে পড়ছে বালু চরে এ হয়তো তারই শব্দ।

এ পাশ ও পাশ করে বনহুর। পাশ ফিরতেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে হুসনার এলায়িত দেহটার উপর। বেড়ার ফাঁকে জোছনার খানিকটা আলো ছড়িয়ে

পড়েছে তার দেহে। সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারেনা বনহুর। অপূর্ব লাগছে ওকে আজ। হুসনার গলায় এখনও ফুলের মালাগুলো জড়িয়ে আছে। কপালে চন্দনের ফোটা। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বালিশে বিছানার বুকে। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে আসে বনহুর ধীর মন্থর পদক্ষেপে হুসনার বিছানার পাশে। একটা দুর্দ্দমনীয় লোভাতুর আকাঙ্খা তাকে চঞ্চল করে তোলে।

একেবারে বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর। দৃষ্টি তার হুসনার মুখে সীমাবদ্ধ। জোছনার আলোতে ওর মুখখানা লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

বনহুরের মুখটা ধীরে ধীরে ঝুকে আসে হুসনার মুখখানার দিকে কিন্তু হঠাৎ বিবেক তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, না না তা হয়না। হুসনা তার আশ্রিতা, অসহায় তরুণী। জলদস্যু তাকে নিষ্পেষিত লাঞ্চিত করেছে, হরণ করেছে তার সতীত্ব কিন্তু সে তো ঐ জলদস্যুর মত নরপশু নয়। তা হয় না—তা হয় না...

বনহুর কুঠির ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলো সেদিন বাইরে। হুসনা বা জেলেরা কেউ জানেনা। জানে শুধু আকাশের অসংখ্য তারা জানে ঐ পূর্ণিমার চাঁদ, জানে আকাশ বাতাস আর সমুদ্র। বনহুর কুঠির ত্যাগ করে এসে বসেছিলো নির্জন সমুদ্র তীরে। মনকে শান্ত সংযত করার জন্য নিজের চুলগুলোতে বার বার আংগুল চালাতে লাগলো।

সমুদ্র তীরের হীমেল হাওয়া তাকে আলিঙ্গন জানালো। জোছনার আলো তাকে বরণ করে নিলো। অসংখ্য তারকা তাকে অভিনন্দন জানালো, সমুদ্রের ঢেউগুলো এসে লুটোপুটি খেতে লাগলো তার পায়ের তলায়। সমীরণে কে যেন কানে কানে বললো...বনহুর তুমি মানুষ নও তুমি অসাধারণ মানুষ...

আজও বনহুর নির্জন সমুদ্র তীরে বসে বসে ভাবছিলো, এমন করে আর কতদিন কাটবে। কতদিন তাকে এ দ্বীপে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। হুসনা যেন দিন দিন গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছে তার সঙ্গে। যতই ওকে দূরে

সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে ততই যেন সে তাকে আঁকড়ে ধরার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর শেষ হবে কবে কখন কোন মুহূর্তে।

হঠাৎ হাসির শব্দ।

পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় হুসনা অদূরে দাঁড়িয়ে। হাসছে। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে সে—আপনি এখানে আর আমি খুঁজে ফিরছি আপনাকে...

হেসে বলে বনহুর—আমিও এখানে আপনার প্রতিক্ষায় বসে আছি।

সত্যি?

হাঁ সত্যি। আসুন আমার পাশে।

হুসনা এসে বসে বনহুরের পাশে। উচ্ছল তার মুখভাব বলে হুসনা এখানে নির্জনে বসে কি ভাবছিলেন?

যদি বলি আপনি বলুন তো কি ভাবছিলাম?

বলবো?

হাঁ বলুন?

কেমন করে আমার কাছ থেকে আপনি পালিয়ে বাঁচবেন তাই ভাবছিলেন। কথাগুলো বলবার সময় হুসনার মুখখানা ম্লান নিষ্প্রভ মনে হলো।

বনহুর প্রথমে বিস্মিত হলো কারণ হুসনা যা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। হুসনার কাছ থেকে তার এ আত্মগোপন নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। বলে বনহুর—মিস হুসনা আপনি যা বলেছেন তা মিথ্যা নয় কারণ আমি দিন দিন আপনার সান্নিধ্যে জড়িয়ে পড়ছি তাই সরে থাকতে চাই...

মিঃ চৌধুরী আমি জানি আপনি আমাকে কেনো এমন ঘৃণা করেন?

ঘৃণা?

হাঁ ঘৃণা করেন বলেই তো আপনি আমাকে এমনভাবে সরিয়ে দিতে চান। মিঃ চৌধুরী আমি জানি আমি অপবিত্র কলঙ্কিত তাই আমি সাহস

করিনি বা করিনা আপনাকে কোনদিন পাবো। আপনি বলেছিলেন যা ঘটে গেছে তা আপনার ইচ্ছাকৃত নয়। তবু কেনো—কেনো আপনি আমাকে এভাবে ঘৃণা করেন।

মিস হুসনা আমি ঘৃণা করি এ কথা কে বললো? বিশ্বাস করুণ আমি আপনাকে একটি ফুলের মতই পবিত্র মনে করি।

তবে কেনো—কেনো আপনি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চান? কেনো আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ান বলুন তো?

মিস হুসনা আপনাকে ভালবাসি বলেই তো আমি...

ঠিক্ ঐ মুহূর্তে একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো বনহুরের বাম হাতের বাজুতে। বনহুর আর্তকণ্ঠে বলে উঠে—উঃ...সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়ে তীরখানা তুলে ফেলে একটানে। সুন্দর মুখন্ডলে একটা দারুণ যন্ত্রনার চিহ্ন ফুটে উঠে বলে বনহুর—মিস হুসনা শীঘ্র পালান...জেলে বাবাকে খবর দিন...বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়েছে আমার দেহে...বনহুর ঢলে পড়ে।

হুসনা ওকে দু'হাতে কোলের মধ্যে টেনে নেয়, ব্যাকুল এবং ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকে—মিঃ চৌধুরী একি হলো আপনার? কিন্তু কোন জবাব সে পেলোনা।

হুসনা তাড়াতাড়ি বনহুরকে বালির উপর শুইয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো জেলে বাবার উদ্দেশ্যে।

পরবর্তী বই
চোরাবালি